অধ্যাপক গোলাম আযম

শেখ হাসিনার দুঃশাসনের ৫ বছর

শেখ হাসিনার
দুঃশাসনের
৫ বছর

অধ্যাপক গোলাম আযম

আল আযামী পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার দুঃশাসনের ৫ বছর
অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশক
আল আযামী পাবলিকেশন্স
১১৯/২ কাজী অফিস লেন
মগবাজার, ঢাকা ১২১৭।

স্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০০৪

মূল্য
বারো টাকা মাত্র

মুদ্রণ
কালারমাস্টার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং

www.pathagar.com

এ পুস্তিকা কেন?

২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বে ২৮ জুলাই থেকে ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমার লেখা 'শেখ হাসিনা দেশের কী কী সর্বনাশ করেছেন' শিরোনামে দৈনিক ইনকিলাবে পাঁচ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। 'বাংলাদেশের নতুন দুর্ভাগ্য' শিরোনামে ২৪ সেপ্টেম্বর (২০০৪) থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত দৈনিক সংগ্রামে চার কিস্তিতে শেখ হাসিনার দুঃশাসনের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, যা আমার আত্মজীবনীমূলক লেখা 'জীবনে যা দেখলাম'-এর পঞ্চম খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। এসবের সমন্বয়ে এ পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হচ্ছে।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার আজব রাজনৈতিক তৎপরতায় তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে বটে, কিন্তু বিগত নির্বাচনে সংসদে আওয়ামী লীগের কম আসন পাওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা বি. এন. পি-র প্রাপ্ত ভোটের কাছাকাছি। তাই এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, আওয়ামী লীগের শিকড় যথেষ্ট মজবুত।

সন্ত্রাস ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ও শেখ হাসিনার কুশাসনে বিপর্যস্ত বাংলাদেশের ক্ষমতায় এসে ৪-দলীয় জোট সরকারের পক্ষে জনগণের প্রত্যাশা আশানুরূপ পূরণ করা অসম্ভব। জনগণের সামান্য অসন্তুষ্টিকেও ভিত্তি করে সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার সুযোগ বিরোধীরা নিচ্ছে। কয়েক বছর আগের কুশাসনের কথা ভুলে গিয়ে জনগণ বিরোধীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হতে পারে।

তাই শেখ হাসিনার দুঃশাসনের চিত্র জনগণের স্মৃতিতে তাজা থাকা প্রয়োজন, যাতে জোটের শাসনের সাথে আওয়ামী দুঃশাসনের তুলনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। এ পুস্তিকাটি ঐ প্রয়োজন পূরণ করবে বলে আশা করি।

আওয়ামী দুঃশাসন থেকে মুক্তির আশায়ই জনগণ ৪-দলীয় জোটকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী করেছে। আশা করা যায় যে, জনগণ কিছুতেই আর ঐ অমানিশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে রাজি হবে না।

গোলাম আযম
৫ ডিসেম্বর ২০০৪

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বাংলাদেশের নতুন দুর্ভাগ্য ৫
দুর্ভাগ্যের পাঁচ বছর ৫
শেখ হাসিনা দেশের কী কী সর্বনাশ করেছেন? ৬
প্রথম সর্বনাশ ঃ বাংলাদেশকে পৈতৃক সম্পত্তি বানানো ৭
আওয়ামী শাসন সম্পর্কে নতুন ভোটারদের অজ্ঞতা ৮
আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্যু ৮
শেখ হাসিনার ৩ দফা কর্মসূচি ৯
১৫ আগস্টে প্রতিক্রিয়া ১০
আওয়ামী লীগ কেন প্রতিবাদ করল না? ১১
ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মুজিব হত্যার বিচার দাবি ১২
শেখ হাসিনার দ্বিতীয় কর্মসূচি ১৩
পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে দেশের সব কিছুতে দখলী স্বত্ব চাই ১৪
দ্বিতীয় সর্বনাশ ঃ গণতন্ত্র হত্যার অপচেষ্টা ১৬
বাকশালী সংসদ ১৭
বিচার বিভাগের উপর জঘন্য হামলা ১৮
সরকারি কর্মকর্তাদের মর্যাদা ১৯
গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচিত সরকারের সাথে স্থায়ী সরকারের সম্পর্ক ১৯
রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ২০
গড়ার নয়, ধ্বংসের যোগ্যতা ২১
তৃতীয় সর্বনাশ ঃ ইসলামকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র ২২
তাহলে তার হজ্জ ও ওমরাহ কি রাজনৈতিক অভিনয়? ২৩
শেখ হাসিনা মাদরাসা ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন কেন? ২৩
তথাকথিত মৌলবাদী গালি ২৪
ফতোয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ ২৫
চতুর্থ সর্বনাশ ঃ আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ধ্বংস করা ২৬
পঞ্চম সর্বনাশ ঃ জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ২৮
জাতীয় ঐক্যের প্রচেষ্টা ৩০
শেখ হাসিনার ভূমিকা ৩০
স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের ধুঁয়া ৩১
রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ৩২
পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ের নীলনকশা ৩৩
জোট সরকারের পতনের আন্দোলন ৩৪
জোট সরকারের পদত্যাগ দাবি ৩৫
পদত্যাগ দাবির যুক্তি ৩৬
আজব দেশপ্রেম ৩৭
শেখ হাসিনার ভূমিকা ৩৮
এ অপপ্রচারের হীন উদ্দেশ্য ৩৯
শেখ হাসিনার রাজনীতি কার স্বার্থে? ৪০

www.pathagar.com

বাংলাদেশের নতুন দুর্ভাগ্য

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মুজিব হত্যার সাথে সাথে বাংলাদেশ বাকশালী স্বৈরশাসনের মহাদুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পেলো। আগস্ট বিপ্লবের ফলে জনগণ নতুন করে স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করলো। ৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক সিপাহী জনতার সংহতি দেশবাসীর মধ্যে এক নবজাগরণ সৃষ্টি করলো। দেশের ভাগ্যের উন্নয়নের সূচনা হলো। ১৯৮০ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যা পর্যন্ত দেশ অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিলো এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হয়েছিলো। ১৯৮১ সালের মার্চ মাস থেকে সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদের ৯ বছরের স্বৈরশাসনামলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত ছিলে বলা যায়; কিন্তু গণতন্ত্র চরমভাবে বিপন্ন হয়।

দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে কেয়ার-টেকার সরকারের পরিচালনায় ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারিতে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার কায়েম হয়। সংসদের সকল রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংসদীয় সরকার পদ্ধতি শাসনতন্ত্রে সংযোজিত হয় এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতি আবার চালু হয়। কিন্তু ১৯৯৪ সালে আবার কেয়ার-টেকার সরকার আন্দোলন করতে হয়। ১৯৯৬ সালের জুন মাসের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করার ফলে শেখ হাসিনা জাতীয় পার্টির সমর্থন পেয়ে প্রধানমন্ত্রী হন।

আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন হওয়াকেই 'আমি বাংলাদেশের নতুন দুর্ভাগ্য' হিসাবে অভিহিত করছি। যদি ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে শাসনতন্ত্রের ১৩ নং সংশোধনীর মাধ্যমে কেয়ার-টেকার সরকার পদ্ধতি আইনে পরিণত না হতো তাহলে দুর্ভাগ্য রজনী কত দীর্ঘ হতো তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনে চারদলীয় জোট সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের ফলে দেশ আওয়ামী দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পেলো।

দুর্ভাগ্যের পাঁচ বছর

শেখ হাসিনার পাঁচ বছরের শাসনকালকে আমি দুর্ভাগ্যের পাঁচ বছর বলতে বাধ্য হচ্ছি। তার শাসনকালে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আদর্শিক ও ধর্মীয় দিকের একটিতেও ইতিবাচক ও কল্যাণকর কোন ভূমিকা তালাশ করে পাচ্ছি না। দেশকে গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ তিনি নেননি। গড়ার বদলে ভাঙার গানই তিনি গেয়েছেন। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধানের নামে দেশের স্বাধীনতাকেই বিপন্ন করেছেন।

www.pathagar.com

আগস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে যারা দেশবাসীকে স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত করে স্বাধীন দেশের নাগরিকত্বের মর্যাদা পুনর্বহাল করলেন তাদেরকে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি দেবার অপচেষ্টা করে জনগণকে তিনি চরমভাবে অপমান করেছেন। যে বিপ্লবকে গোটা জাতি স্বাগত জানালো— তিন সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসন পূর্ণ সমর্থন দান করলো, এমনকি আওয়ামী লীগের নেতা ও এমপিগণ পর্যন্ত মুশতাক সরকারে শরীক হলেন এবং মুজিব আমলের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ মুশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদান করলেন, শেখ হাসিনা ঐ বিপ্লবীদেরকে ফৌজদারি আইনের আওতায় সাধারণ খুনী হিসেবে বিচার করে জনগণের অন্তরে কঠোর আঘাত হানলেন।

শেখ হাসিনা দেশের কী কী সর্বনাশ করেছেন?

শেখ হাসিনার বিগত পাঁচ বছরের দুঃশাসন ও কুশাসনে বাংলাদেশের সর্বাত্মক সর্বনাশ হয়েছে। কী কী সর্বনাশ তিনি করেছেন এর তালিকা দীর্ঘ। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তা তুলে ধরা অসম্ভব। দেশবাসীর নিকট ধারাবাহিকভাবে এ বিষয়টি তুলে ধরা আমি জাতীয় কর্তব্য মনে করছি। বিগত পাঁচ বছরের কুশাসনকে আমি আওয়ামী লীগের শাসন না বলে শেখ হাসিনার অপশাসন বলাই অধিকতর সঠিক বলে মনে করি। কারণ তিনিই তার দলের মধ্যে সবচেয়ে দাম্ভিক, হিংস্র, উগ্র, সন্ত্রাসী, কটুভাষী, চাপাবাজ, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও আক্রমণাত্মক। তার শাণিত জিহ্বা বিষ দিয়ে তৈরি বলে মনে হয়।

সাধারণত দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে চরমপন্থী ও উগ্র কিছু লোক থাকে। দলীয় প্রধান তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। নেতার মধ্যে এ গুণ না থাকলে চলে না। বিশ্বে শেখ হাসিনাই এ বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম। তার উদারহণ একমাত্র তিনিই। এর প্রমাণ অনেক আছে। দুটো উদাহরণই এর জন্য যথেষ্ট।

চট্টগ্রামে এইট মার্ডারের ঘটনার পরপরই তিনি সেখানে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার দায়িত্ব ছিল এর সুষ্ঠু তদন্তের নির্দেশ দান এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ঘোষণা দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া। তিনি এর বিপরীত আচরণই করলেন। বিনা তদন্তে তিনি তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করে তার দলের সন্ত্রাসীদেরকে এজন্য ভর্ৎসনা করলেন যে, তারা এর প্রতিক্রিয়ায় কেন ৮ জনের বদলে ৮০ জনকে খুন করল না। তিনি তাদেরকে লজ্জা দেবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলেন যে, তারা কি শাড়ি-চুড়ি পরে বসে আছে? তিনি নির্দেশ দিলেন যেন একটি লাশের বদলে দশটি লাশ ফেলা হয়। শুধু দলীয় প্রধান হিসেবে তিনি এ হিংস্র ভূমিকা পালন করেননি। দেশের আইন-শৃঙ্খলার প্রধান দায়িত্বে অবস্থান করে তিনি এমনভাবে কেমন করে বলতে পারলেন তা বিশ্বের বিষম বিস্ময়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় উদাহরণটি হল, তার প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অব) রফিকুল ইসলামকে অপসারণ করে মুহাম্মদ নাসিমকে এ পদে নিয়োগদান। যে নরহিংস্রতা ও প্রতিহিংসা নিয়ে এ দায়িত্ব পালন করা তিনি জরুরী মনে করেন, মেজর রফিক সে বিবেচনায় সম্পূর্ণ অযোগ্যতার পরিচয় দেবার কারণেই তাকে বরখাস্ত করা হল।

শেখ হাসিনার এমন একজন যোগ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়োজন ছিল, যিনি তার মানের সন্ত্রাসী ভূমিকা পালনে সক্ষম, যার জিহ্বা তার মতোই শাণিত, যে গোটা পুলিশ বাহিনীকে দলীয় সন্ত্রাসীদের দোষরের ভূমিকা পালনে বাধ্য করতে সক্ষম, যে বিরোধীদলকে চরমভাবে দমনের জন্য তার প্রতিটি নির্দেশ সন্তোষজনকভাবে পালনে পারঙ্গম, যে বোমা বিস্ফোরণের নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বিনা তদন্তে ও বিনা বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে হামলা, মামলা, যুলুম ও নির্যাতন চালাতে বাহাদুরির পরিচয় দিতে পারে এবং বিচারপতিগণকে লাঠির ভয় দেখিয়ে শেখ হাসিনার ইচ্ছা মোতাবেক আদালতকে রায় দিতে বাধ্য করার কৌশল যে জানে। এ দুটো প্রমাণই আমার এ দাবির জন্য যথেষ্ট যে, আওয়ামী লীগ একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে দেশের সর্বনাশের জন্য প্রধান দায়ী নয়, প্রধান দায়ী শেখ হাসিনা। এ দলের একমাত্র মূলধন শেখ মুজিব। তাই এ দলের নেতৃত্বে মুজিব কন্যার মর্জির সাথে সামান্যও খাপ খায় না এমন চিন্তার লোকের কোন স্থান নেই। যদি কেউ সামান্য ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করে তাহলে তার দশা অবশ্যই ড. কামাল হোসেন ও কাদের সিদ্দিকীর মতই হবে।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এ বংশীয় নেতৃত্ব চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই এমন নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারীর যেমন দাপট থাফা স্বাভাবিক তা শেখ হাসিনার মধ্যে থাকবে না কেন? "Power always corrupts and absolute power corrupts absolutely" বিশ্বের একটি বিখ্যাত প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। এ বাক্যটি শেখ হাসিনার বেলায় শতকরা একশ ভাগ প্রযোজ্য। তাই আওয়ামী লীগ নয়, শেখ হাসিনাকেই গত পাঁচ বছরের সকল কর্মকাণ্ডের কৃতিত্বের অধিকারী বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। তিনি দেশের কী কী মহাসর্বনাশ সাধন করেছেন এর ধারাবাহিক বিবরণ দেশবাসীর খেদমতে পেশ করতে চাই।

প্রথম সর্বনাশ ঃ বাংলাদেশকে পৈতৃক সম্পত্তি বানানো

১৯৯১-এর নির্বাচনী প্রচারাভিযানে শেখ হাসিনার বক্তব্য, কণ্ঠস্বর, ভাবভঙ্গি আওয়ামী লীগ নেতাদের স্বাভাবসুলভ আক্রমণাত্মক ও দাম্ভিকতাপূর্ণ ছিল। আওয়ামী লীগ বিরোধী ভোট তিন ভাগে বিভক্ত হবে এবং তিনি ক্ষমতাসীন হবেন এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন– তার ভাবসাব থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির সমর্থক ভোটাররা সবাই আওয়ামী লীগ বিরোধী।

তাই ১৯৯৬-এর নির্বাচনী অভিযানে তিনি এর সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রচারাভিযানের অতি নিকটবর্তী সময়ে তিনি হজ্জে যান। ইহরামের রুমাল

www.pathagar.com

মাথায় বাঁধা অবস্থায় তসবীহ হাতে বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। সারাদেশে নির্বাচনী সফরে তিনি ইহরামের রুমাল পরিহিত অবস্থায়ই জনগণের সামনে তাপসীর ভূমিকায় অভিনয় করতে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার সময়ও মাথায় ঐ পট্টি এবং হাতে তসবীহ ছিল। '৯৬-এর নির্বাচনী বক্তব্যে তার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাষা ব্যবহার করেছেন। চরম বিনয়ী ভাব প্রদর্শন করে তার পিতার কুশাসনের জন্য জনগণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছেন। একটিবারের জন্য জনগণের খেদমতের সুযোগ দেওয়ার জন্য কাতর আবেদন জানিয়েছেন।

আওয়ামী শাসন সম্পর্কে নতুন ভোটারদের অজ্ঞতা

১৯৭২ থেকে ১৯৭৫-এর আওয়ামী দুঃশাসন যারা দেখেনি, ভোটারদের মধ্যে ১৯৯৬-এ তাদের সংখ্যা বিরাট হওয়াই স্বাভাবিক। '৭৫-এ যাদের বয়স ১০-এর বেশি ছিল না এবং '৭৭ পর্যন্ত যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারা '৯৬-এ ভোটার ছিল। এ বয়সের লোকেরাই নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে। এ বিপুলসংখ্যক ভোটারের আওয়ামী শাসনের কোন তিক্ত অভিজ্ঞতাই ছিল না। আওয়ামী লীগ যে কি চিজ তা তারা গত পাঁচ বছরে প্রথম হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

যারা শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন দেখেছে তাদের মধ্যে আলহাজ্জ শেখ হাসিনার সফল নির্বাচনী অভিনয়ে কিছু লোকের এ ধারণা হয়ে থাকতে পারে যে, বর্তমান আওয়ামী লীগ আগের মত নয়।

তা ছাড়া ১৯৯১ সালে বিজয় নিশ্চিত মনে করে আওয়ামী লীগ জাল ভোট, ব্যালট ডাকাতি, ভোটকেন্দ্র দখল ইত্যাদিতে যে যোগ্যতার অধিকারী তা প্রয়োগ করা প্রয়োজন মনে করেনি। কিন্তু ১৯৯৬-এর নির্বাচনে এ বিষয়ে গুরুত্বসহকারেই অবদান রেখেছে। এ ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরাই সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। বহু ভোটকেন্দ্রে প্রশাসন ও পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেনি।

এ সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে শতকরা ৬৩ জন ভোটার ভোট দিয়েছে। আওয়ামী লীগ ১৫১টি আসনে জয়ী হতে ব্যর্থ হয়েছে। এরশাদ কারামুক্তির আশায় সরকার গঠনে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করায় শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হন।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্যু

শেখ হাসিনার আসল এবং একমাত্র নির্বাচনী ইস্যু ছিল একটিবারের জন্য জনগণের খেদমত করার আকুল আবেদন। ২১ বছর আগে আমরা যা ভুল করেছি তা মাফ করে একবার ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন। রাজনৈতিক ইস্যুর মধ্যে মাঝে মাঝে তিনি প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি পরিবর্তন করে সংসদীয় পদ্ধতি দাবি করতেন। তবে আসল ইস্যু ছিল একবার মাত্র ক্ষমতা দেওয়ার আবেদন।

মুজিব হত্যার বিচার দাবি করা দূরের কথা, গোটা নির্বাচনী অভিযানে একবারও মুজিব হত্যা সম্পর্কে কোন কথা তিনি বলেননি। ১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ

www.pathagar.com

এবং ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচনেও তিনি মুজিব হত্যার বিচার দাবি করেননি। তৃতীয় ও পঞ্চম জাতীয় সংসদে তিনি বিরোধীদলীয় নেতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকালে কখনও মুজিব হত্যার বিচার দাবি করেননি।

কোন্ পটভূমিতে মুজিব হত্যার মত ঘটনা ঘটেছিল এবং জনগণের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল এ বিষয়ে শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। অথচ ক্ষমতায় এসেই মুজিব হত্যার বিচার করা হাসিনা সরকারের প্রধান কর্মসূচিতে পরিণত হয়ে গেল। বিবিসির প্রখ্যাত সাংবাদিক সিরাজুর রহমানের লেখার কথা মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন যে, শেখ হাসিনা নিজের মুখেই তাকে নাকি বলেছেন, আমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই রাজনীতি করছি।

শেখ হাসিনার ৩ দফা কর্মসূচি

গত পাঁচ বছর শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে তার পৈতৃক সম্পত্তির মত ব্যবহার করে তিন ধরনের কর্মসূচি পালন করেন ঃ

১. শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

২. দেশে যত রকম প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা ও সংস্থা রয়েছে, যা কোন ব্যক্তির নামের সাথে যুক্ত নয়, সেসবের সাথে তার পিতা-মাতা, ভাইবোন ও আত্মীয়দের নাম সম্পৃক্ত করা।

৩. দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হল, হাটবাজার, ঘাট, ব্যাংক, বীমা, সরকারি খাস জমি ও বস্তি এলাকা দলীয় লোকদের দখলে আনা এবং সকল প্রকার পেশাজীবী সমিতির কর্তৃত্ব দলীয় লোকদের হাতে তুলে দেওয়া। জাতির পিতার ইস্যু—কোন ব্যক্তিকে জাতির পিতার মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি জনগণের আবেগের সাথে জড়িত। শক্তি প্রয়োগ করে বা আইনের দাপটে ঐ আবেগ সৃষ্টি করা যায় না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব জনগণের কাছে অবশ্য স্বীকৃত। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় তিনি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তারই নেতৃত্বে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। তখন আওয়ামী লীগের একদলীয় শাসনই কায়েম ছিল। দলীয় লোকেরা শেখ মুজিবকে জাতির পিতা বললেও দেশের সংবিধান জনগণকে জাতির পিতা বলতে বাধ্য করেনি। তিন বছরের মধ্যে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। তার শাসনামলে জনগণ চরম হতাশায় পতিত হয়। '৭৪-এর দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ লোক মারা যায়। তার দলের লোকেরা রিলিফের মাল লুটপাট করায় জনগণের দুর্দশা চরমে পৌঁছে। শেখ মুজিব নিজেই তার দলকে 'চোরের খনি' অভিধায় উল্লেখ করেন। রিলিফ থেকে নিজের ভাগের কম্বলটিও উদ্ধার করতে তিনি ব্যর্থ হন। আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনীতি সচেতন লোকেরা মেজর জলিলের নেতৃত্বে

www.pathagar.com

জাসদের সাথে জড়িত হয়ে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং বিকল্প শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে '৭৫-এর জানুয়ারিতে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করে গণতন্ত্র ধ্বংস করা হয় এবং একদলীয় স্বৈরশাসন কায়েমের ব্যবস্থা করা হয়। দেশে স্লোগান চালু করা হয়- 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ'।

এভাবে শেখ মুজিব দেশের মহারাজা হয়ে চরম একানায়কত্ব কায়েম করেন। আয়তনে খুব ছোট এ বাংলাদেশটিতে ৬১ জন আওয়ামী লীগ নেতাকে গভর্নর (রাজা) নিযুক্ত করেন। তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে বেআইনী ঘোষণা করে বাকশাল নামে একটি দল গঠন করেন। সেনাবাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসন কর্মকর্তা, অধ্যাপক, সাংবাদিক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিসহ সকল পেশার লোকদের বাকশালে যোগদান করতে নির্দেশ দেন।

১৫ আগস্টের পর পরই ৬১ জন গভর্নরের শপথ গ্রহণ করার কথা ছিল, প্রত্যেক এলাকার সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সরকারি কর্মচারী এবং বাকশাল দলটি একজন গভর্নরের নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা ছিল। যদি রুশমার্কা এ ব্যবস্থা চালু হয়ে যেত, তাহলে এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন পথই আর থাকত না। শেখ মুজিবের বংশীয় রাজতন্ত্রই কায়েম হয়ে যেত। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের সকল পথ এভাবেই বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করা হয়। এ মারাত্মক ব্যবস্থাটি চালু হওয়ার পূর্বক্ষণে যদি '৭৫-এর ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান না ঘটত তাহলে আজও এ দেশ শেখ বংশীয় গোলামির জিঞ্জিরেই আবদ্ধ থাকত।

১৫ আগস্টে প্রতিক্রিয়া

খন্দকার মুশতাক আহমদ রাষ্ট্রপ্রধান হলেন। তিন সশস্ত্র বাহিনী প্রধান তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। আওয়ামী লীগের এমপিগণ মুশতাক সরকারের বিরুদ্ধে কোন সামান্য প্রতিবাদও করলেন না; বরং শেখ মুজিবের ১৬জন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী মুশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন। সেনাপ্রধানও প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। শক্তিশালী বাকশালের পক্ষ থেকেও প্রতিবাদ মিছিল বের হল না। গভর্নর পদে নিয়োগপ্রাপ্তদেরও কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। জনগণের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে কথা ঐ সময় যাদের বয়স অন্তত ১০/১২ বছর ছিল তাদেরও স্পষ্ট মনে থাকার কথা। গত ১৫ জুলাই (২০০১) রাতেই কেয়ার-টেকার সরকার কায়েম হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ বিপুল সংখ্যায় মুক্তির আনন্দ যেভাবে প্রকাশ করেছে, '৭৫-এর আগস্টে জনগণ এরচেয়েও বহুগুণ বেশি আবেগ-উচ্ছ্বাস ও আনন্দে মেতে উঠেছিল।

আমি তখন লন্ডনে ছিলাম। সেখানকার পত্রিকায় জনগণের যে প্রতিক্রিয়া আমি পড়েছি তা হুবহু উদ্ধৃত করছি ঃ "It was Friday, Curfew was lifted For two

www.pathagar.com

hours to facilitate Friday prayers. People in huge number passed the streets in jubilant mood as if they were going to observe any National Festival" 'দিনটি শুক্রবার ছিল। জুমার নামাযের জন্য কারফিউ দু'ঘণ্টার জন্য তুলে নেওয়া হয়। জনগণ বিরাট সংখ্যায় আনন্দ মুখর ভঙ্গিতে রাজপথে চলছিল, যেন তারা কোন জাতীয় উৎসব পালন করতে যাচ্ছে।'

ঐ সময় যারা ঢাকায় ছিলেন তারাই সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, লন্ডনের পত্রিকা সঠিক রিপোর্ট দিয়েছে কি-না। ১৯৯৪-এর জুন মাসে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আমার নাগরিকত্ব বহাল করার পর পল্টন ময়দানসহ বহু জনসভায় আমি লন্ডনের পত্রিকার উক্ত উদ্ধৃতি দেশবাসীকে শুনিয়েছি। অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, আমার বক্তৃতার অন্যান্য পয়েন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও এ পয়েন্টটা যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

আমি জনসভায় এ ঘটনা উল্লেখ করে মন্তব্যও করেছি যে, ১৫ আগস্টের ঘটনা যদিও দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনেনি, তবুও জনগণের মধ্যে উপরিউক্ত প্রতিক্রিয়া এ কথাই প্রমাণ করে যে, শেখ মুজিবকে জনগণ জাতির পিতা হিসেবে শ্রদ্ধা করেনি; বরং তার কুশাসন থেকে মুক্তি পেয়ে পরম স্বস্তিবোধ করেছে এবং আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, শেখ মুজিব জাতির পিতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিতই হননি, যদি হতেন তাহলে তার নিহত হওয়ার কারণে রাস্তায় নেমে জনগণ অবশ্যই বিলাপ করত। বিলাপ করা তো দূরের কথা কেউ প্রকাশ্যে ইন্না লিল্লাহ পড়েছিল বলেও নাকি জানা যায়নি।

আওয়ামী লীগ কেন প্রতিবাদ করল না?

শেখ মুজিবকে 'জাতির জনক', 'বঙ্গবন্ধু' ও 'এক দেশ এক নেতা'র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বলে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ ১৫ আগস্টের এত বড় মর্মান্তিক ঘটনার সামান্য প্রতিবাদ পর্যন্ত কেন করল না? শেখ হাসিনা '৮১ সালে দিল্লী থেকে দেশে ফিরে আসার পর এর বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য কোন কর্মসূচি কেন গ্রহণ করলেন না? জাতীয় সংসদে '৮৬ সাল থেকে '৯৬ পর্যন্ত বিরোধীদলীয় নেতা থাকা অবস্থায় ১৫ আগস্ট সরকারিভাবে জাতীয় শোক দিবস পালনের প্রস্তাব কেন পেশ করলেন না? জাতির পিতার খুনিদের বিচার করার দাবিতে কোন আন্দোলন কেন করলেন না? '৮৬, '৯১ ও '৯৬-এর নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোর কোন একটাতেও এটাকে কেন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করলেন না?

এসব কেনর জবাব একটাই। তারা বাস্তবে লক্ষ্য করেছেন যে, এই ইস্যুতে জনগণের কোন সামান্য সাড়াও পাওয়া যাবে না। সাধারণ জনগণের অন্তরে শেখ মুজিবের প্রতি যে কোন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নেই সে কথা বুঝতে তাদের বেগ পাওয়ার কথা নয়।

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মুজিব হত্যার বিচার দাবি

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আরোহণের পর মুজিব হত্যার বিচারের ব্যবস্থা করেন। সাধারণ খুনির বিচারের জন্য যে আইন দেশে আছে সে ফৌজদারি আইনেই বিচারের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ কোর্ট গঠন করেন। খুনের বিচারের যে আইন রয়েছে তা ঐসব খুনিদের জন্য, যারা ব্যক্তিগত বা অন্য কোন স্বার্থে কোন মানুষকে খুন করে।

মুজিব হত্যা কি সে ধরনের খুন? কোন দেশে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হলে এটাকে সফল বিপ্লব বলা হয়। যদি বিপ্লব ব্যর্থ হয় তাহলে অভ্যুত্থানকারীরা দণ্ড ভোগ করে। আর যদি সফল হয় তাহলে তারাই ক্ষমতাসীন হয়।

'৭৫-এর ১৫ আগস্ট যে সেনা অভ্যুত্থান হয় তা সফল বিপ্লব হিসেবেই গণ্য ছিল। তারা ব্যাপক গণসমর্থন পেয়েছিল। সশস্ত্র বাহিনীও তা মেনে নিয়েছিল। কোন রাজনৈতিক অস্থিরতাও সৃষ্টি হয়নি। আওয়ামী লীগই ক্ষমতাসীন থাকে। অন্য কোন দল ক্ষমতাসীন হয়নি।

'৭৫-এর ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ প্রতিবিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং সিপাহীরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার এক বিস্ময়কর যৌথ বিপ্লব সফল হয়। এতেও অনেক সেনা অফিসার নিহত হয়। এরই ফলে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হন।

'৭৫-এর ১৫ আগস্টের সেনাবিপ্লব, ৩ নভেম্বরের প্রতিবিপ্লব এবং ৭ নভেম্বরের সিপাহীবিপ্লবে নিহতদের বিষয়টাকে ফৌজদারি আইনের সাধারণ খুন হিসেবে গণ্য করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই এসব খুনের জন্য কোন মামলাও হয়নি। শেখ মুজিবের শাসনামলে রক্ষীবাহিনী দিয়ে হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা কর্মীকে হত্যা করা ও গ্রেপ্তার অবস্থায় সিরাজ সিকদারকে বিনা বিচারে হত্যা করা কি '৭৫-এর আগস্ট ও নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড থেকেও আইনের দৃষ্টিতে অধিক জঘন্য নয়?

ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে ঐসব খুনের বিচারও জরুরী। শুধু শেখ মুজিবের বিচার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে কোন যুক্তিতে? যুক্তি একটাই। শেখ মুজিবকে জাতির পিতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হবে। ভক্তি-শ্রদ্ধা ভালোবাসা শক্তি প্রয়োগ করে আদায় করা যায় না। '৭৫-এর আগস্টে মুজিব হত্যার যে প্রতিক্রিয়া জনগণের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা গেছে তাতে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, জনগণের অন্তরে শেখ মুজিবের প্রতি সামান্য ভালোবাসাও অবশিষ্ট ছিল না।

শেখ হাসিনা তার পিতাকে জাতির পিতা হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। সর্বত্র শেখ মুজিবের ফটো রাখা বাধ্যতামূলক করে আইন

www.pathagar.com

পাস করেছেন। তার মূর্তি বানিয়ে মহামানবের মর্যাদা দিতে চেষ্টা করেছেন। এসব করে কি তার মর্যাদা সত্যিই বৃদ্ধি পেয়েছে? দেশের মানুষ কি শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে ভালোবাসে বলে কেউ প্রমাণ করতে পারবে?

শেখ হাসিনার দ্বিতীয় কর্মসূচি

দেশের যত প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও স্থাপনার সাথে কোন মানুষের নাম যুক্ত নেই, সেসবের সাথে শেখ হাসিনার পিতা, মাতা, ভাই, বোন ও আত্মীয়-স্বজনের নাম যুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'যমুনা সেতু'র নাম 'বঙ্গবন্ধু সেতু' হওয়ার বহু আগে থেকেই লোকের মুখে মুখে ছিল। এর সাথে বঙ্গবন্ধু শব্দ জুড়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু নামকরণ করা হয়, কিন্তু জনগণ এটাকে 'যমুনা সেতু'ই বলে। তাই যমুনা শব্দ বাদ দিয়ে শুধু 'বঙ্গবন্ধু সেতু'ই নামফলকে লাগিয়ে এ নাম বলতে বাধ্য করার চেষ্টা করা হল। কিন্তু আমি উত্তরবঙ্গে বহু জনসভা ও পথসভায় লোকদের এ সেতুর নাম জিজ্ঞেস করায় তারা সবাই 'যমুনা সেতু'ই বলল। মানুষের মনের উপর জোর-জবরদস্তি চলে না। পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল ইনস্টিটিউটকে বহু বছর থেকে সবাই পিজি হাসপাতালই বলে এসেছে। এটাকে বিশ্ববিদ্যালয় মানে উন্নীত করে বঙ্গবন্ধু নাম এতে যুক্ত করা হল। নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে এ নাম যুক্ত করলে অযৌক্তিক হয় না। কিন্তু পুরাতন প্রতিষ্ঠানের একটা পরিচিত নাম বদলিয়ে শেখ হাসিনার পিতার উপাধি যুক্ত করা কি শোভন হয়েছে? নমুনাস্বরূপ এ দুটো উদাহরণ দেওয়া হল। অগণিত প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও স্থাপনার সাথে শেখ হাসিনার পিতা, মাতা ও ভাইবোনের নাম যুক্ত করা দ্বারা দেশের বা জনগণের কোন খেদমত বা কল্যাণ হয়েছে? বাংলাদেশটা যেন তাদের পৈতৃক সম্পত্তি, তাই সর্বত্র তাদের নাম কায়েম রাখতে হবে।

তার শাসনের শেষ তিন মাসে এমন অগণিত প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, যার নির্মাণকাজ কবে শুরু হবে তা অনিশ্চিত। শেষ ১৫ দিনে তো দৈনিক তিন-চারটি করে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এমনকি তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও দু'দিন জোর করেই ক্ষমতা আঁকড়ে রেখে আরও কয়েকটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এর উদ্দেশ্য একটাই, তার নামফলকের কারণে নতুন সরকারের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জায়গা যাতে তেমন অবশিষ্ট না থাকে।

সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে। প্রশাসন ও পুলিশকে তিনি চরম দলীয়করণের ভিত্তিতে যেভাবে সাজিয়ে রেখে গেলেন সে আবর্জনা অপসারণ করতেই কেয়ার-টেকার সরকারের দু'মাস লেগে যাওয়ার কথা। অথচ তিনি চরম স্বেচ্ছাচারিতা করে দু'দিন বিনষ্ট করে কেয়ার-টেকার সরকারের জন্য ৮৮ দিন সময় দিলেন। ১৫ তারিখে আওয়ামী লীগের

www.pathagar.com

জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর দাপট দেখিয়ে রেডিও ও টিভিকে অপব্যবহারের মহৎ উদ্দেশ্যেই ঐ দু'দিন জোর করে ক্ষমতায় থাকলেন। দেশটা তার পৈতৃক সম্পত্তি। তাই মহামান্য প্রেসিডেন্টও তার এ স্বেচ্ছাচার রোধ করার সাহস পাননি। এমনকি কেয়ার-টেকার সরকারপ্রধানের শপথ অনুষ্ঠানের সময়টুকু পর্যন্ত তার নির্দেশে বঙ্গভবনের মুদ্রিত দাওয়াত পত্রে পরিবর্তন করতে হয়। তার সে দাপট এখনও অব্যাহত আছে। তার সেট করা প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তাদের বদলি করায় তিনি কেয়ার-টেকার সরকারের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে যা তা বলে চলেছেন। তার দাবি এই যে, নির্বাচিত সরকার হিসেবে তার এমনই মর্যাদা যে, তার মনোনীত সরকারি কর্মকর্তাদের বদলি করার কোন অধিকারই অনির্বাচিত সরকারের থাকতে পারে না।

পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে দেশের সব কিছুতে দখলী স্বত্ব চাই

শেখ হাসিনার পাঁচ বছর দুই দিনের শাসনকালে দেশের সব কিছু তার আত্মীয় ও দলীয় লোকদের মৌরসী-পাট্টা। এ বিষয়ে সারাদেশের ফিরিস্তি এক সময় হয়তো তৈরি হবে অন্যায় দখল উচ্ছেদ করার প্রয়োজনে। এখানে স্বল্পপরিসরে কিছু উদাহরণই যথেষ্ট মনে করি।

১. সেনাবাহিনীতে অনেক যোগ্য জেনারেল থাকা সত্ত্বেও শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়ার কারণে একজন অবসরপ্রাপ্ত অযোগ্য জেনারেলকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি সেনাবাহিনীর মান বৃদ্ধি করেছেন, না হ্রাস করেছেন তা পরবর্তী সরকার তদন্ত করলেই বিস্তারিত জানা যাবে। তিনি আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বিরাট একটি খেদমত করেছেন। সকল ক্যান্টনমেন্টে আওয়ামীপন্থি কয়েকটি পত্রিকা ছাড়া সকল পত্রিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে সেনাবাহিনীর লক্ষাধিক জনশক্তিকে হাসিনাপন্থি বানানোর অপচেষ্টা করেছেন। ঐ জঘন্য নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ রয়েছে বলে জানলাম।

২. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে অপসারণ করে শেখ হাসিনার বংশবদ লোকদের বসানো হয়েছে। গত পাঁচ বছরে তারা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতেই নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। শেখ হাসিনার নিয়োজিত ভাইস চ্যান্সেলরদের উপর সবচেয়ে বড় ও মহান দায়িত্ব ছিল, শেখ হাসিনার সোনার ছেলেদের হল ও ইউনিভার্সিটিতে পূর্ণ দখলী স্বত্ব দান করা এবং অন্যান্য ছাত্র সংগঠনকে উৎখাত করে ছাত্রলীগকে একচেটিয়া কর্তৃত্ব দেওয়া।

৩. দেশের সকল কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান পদে দলীয় নির্ভরযোগ্য লোকদের বসিয়ে দেওয়া, যাতে দলীয় আনুগত্যের নিশ্চয়তা ছাড়া কোন শিক্ষক নিয়োগ না পায়।

www.pathagar.com

৪. যত পেশাজীবী সমিতি রয়েছে তাতে নেতৃত্বের পদে দলীয় লোকদের বসানোর জন্য সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে যত রকম ষড়যন্ত্র ও নির্লজ্জ ভূমিকা পালন করা সম্ভব তা করতে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতি ও জেলা বার সমিতি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি সমিতি থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রেই দলীয়করণের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে ত্রুটি করেননি।

৫ সম্পদ দখলের ব্যাপারটা বিরাট। ব্যাংক, বীমা, গাড়ি, সরকারি খাস জমি, বস্তি, হাট-বাজার ও ঘাটের ইজারা, দুর্বল লোকদের বাড়ি-ঘর ও জমিজমা দখল ইত্যাদির জন্য শেখ হাসিনা তাঁর দলের সবাইকে অবাধ লাইসেন্স দিয়েছেন। মন্ত্রী ও মন্ত্রিপুত্র, প্রভাবশালী আওয়ামী নেতা ও দলীয় ক্যাডার হলে তো পুলিশের বাপেরও সাধ্য নেই বাধা দেওয়ার। থানার দারোগা আসল দারোগা নয়। দলীয় নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দারোগার কিছুই করার সাধ্য ছিল না। তাই কোন দখলী কেসই থানা গ্রহণ করেনি। এভাবে গোটা দেশে আওয়ামী লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করা হয়। কেউ মামলা করলে সে বাদীকেই পালিয়ে জান বাঁচাতে হয়। শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের শাসনে আওয়ামী লীগ দলীয় বিরাটসংখ্যক নতুন ধনপতি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার কোটি টাকার রিলিফের সম্পদও তারা দখল করে। শেখ হাসিনার পাঁচ বছর শাসনামলে তার দলের কোন কর্মী হয়তো সম্পদ আহরণে বঞ্চিত হয়নি। একটি বিরাট ধনিক শ্রেণী সৃষ্টি করে শেখ হাসিনা এমন একটি অবস্থান অর্জন করেছেন যে, আগামী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হতে না পারলে বিরাট শক্তি প্রদর্শনের যোগ্যতা প্রয়োগ করে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা কায়েম করতে পারবেন।

৬. দখলের তালিকায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শেখ হাসিনার গণভবন দখল। তিনি জাতির পিতার কন্যা, আওয়ামী লীগ প্রধান ও সর্বাপেক্ষা শক্তিধর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ছোট-খাটো কোন সম্পত্তি দখল করলে মোটেই মানায় না। তিনি দাপটের সাথেই সাংবাদিকদের কাছে পূর্ণ আস্থাসহকারে দাবি করেছেন যে, যদ্দিন তিনি রাজনীতি করবেন তদ্দিন গণভবনেই থাকবেন।

পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা করেই তো তিনি অল্পদিনের জন্য ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন। তাই তিন মাস পরই আবার তাকে যখন গণভবনে আসতেই হবে, তখন খামাখা তল্পিতল্পা নিয়ে যাওয়া-আসার প্রয়োজন কি? কিন্তু শেখ হাসিনা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে দেখলেন যে, তারই সুপারিশকৃত প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। যে প্রধান বিচারপতি তার মন্ত্রীদের লাঠির ভয়ে চুপ থাকতে বাধ্য ছিলেন, তিনি কেয়ার-টেকার সরকারপ্রধান হয়ে তার লোকদের বদলি করার দুঃসাহস দেখাচ্ছেন। এ অবস্থায় নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার

www.pathagar.com

পর সকল রাজনৈতিক দলের দাবিতে এবং কেয়ার-টেকার সরকারের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করার জন্য তাকে গণভবন ত্যাগ করতে বাধ্য করাও অসম্ভব নয়। তাই ইজ্জত থাকতেই সরে পড়া উচিত মনে করে হয়তো তিনি গণভবন ছেড়ে দিলেন। কিন্তু গণভবন দখল করে যে কলঙ্কের ভাগী হলেন তা তো স্থায়ীভাবে তার কপালে লিখিত থাকবে।

দ্বিতীয় সর্বনাশ ঃ গণতন্ত্র হত্যার অপচেষ্টা

'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' প্রবচনটি মনে আসে যখন শেখ হাসিনাকে 'গণতন্ত্রের মানসকন্যা' বলা হয়। তার কথা, কাজ, মেজাজ ও আচরণে গণতান্ত্রিকতার সামান্য গন্ধও যে পাওয়া যায় না, সে কথা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই লিখছি। এ দেশকে সোনার বাংলা বানানোর জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন এর সকল স্বপ্নই তার পিতা দেখতেন বলে তিনি দাবি করেন। যমুনা সেতু নাকি তারই পিতার স্বপ্ন। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ও তারই স্বপ্ন। শেখ হাসিনা তার পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যই গত পাঁচ বছর সব কিছু করেছেন। আবার ক্ষমতায় যেতে পারলে অবশিষ্ট স্বপ্ন বাস্তবে রূপদান করার অভিলাষ রাখেন। সত্যি সত্যিই তার পিতা এতসব স্বপ্ন দেখেছিলেন কি-না তা দেশবাসীর জানার সুযোগ হয়নি। তবে একটি মহাস্বপ্ন যে তিনি দেখেছিলেন এবং তা কার্যকর করার আইনগত ও প্রশাসনগত প্রস্তুতি যে তিনি সম্পন্ন করেছিলেন, সে কথা দেশ-বিদেশের সবার জানার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি এ দেশের একচ্ছত্র বাদশাহ হতে চেয়েছিলেন। ৬১ জন গভর্নরের গভর্নর জেনারেল হওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর জন্য প্রথমত ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে জাতীয় সংসদে শাসনতন্ত্রের ৪র্থ সংশোধনী মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে পাস করিয়ে দিলেন।

আওয়ামী লীগের বিশাল পার্লামেন্টারী পার্টি পরম উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদর্শন করে আদর্শ গণতান্ত্রিক দলের গৌরব অর্জন করে। বিনা আলোচনায় ও বিনা প্রতিবাদে সংসদে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির শাসনতন্ত্রকে তথাকথিত প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে পরিণত করা হল এবং আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে 'বাকশাল' নামক একটি মাত্র দলে সেনাবাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তাসহ দেশবাসী সবাইকে ঐ দলে যোগদান করার নির্দেশ দেওয়া হল। "এক নেতা, এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ" শ্লোগান চালু করে গণতন্ত্রের বাংলাদেশী সংস্করণ আবিষ্কার করা হল। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী ও ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন এর প্রতিবাদে সংসদ থেকে পদত্যাগ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শনের সাহস কোত্থেকে পেলেন তা ঐ সময় ও পরিবেশে অবশ্য বিস্ময়েরই বিষয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শেখ হাসিনা যা কিছু করেছেন সবই তার পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই করছেন। তাহলে শেখ মুজিবের বাকশাল পদ্ধতির শাসনও, যা তার মহাস্বপ্ন ছিল, তা কায়েমের জন্য মুজিবকন্যার সর্বশক্তি প্রয়োগ করাই স্বাভাবিক। কারণ এটাই ছিল শেখ

www.pathagar.com

মুজিবের সেরা স্বপ্ন। কিন্তু ঐ পদ্ধতি জনগণের কাছে এতটা ঘৃণিত ছিল যে, শেখ হাসিনা তার পিতার দেওয়া প্রিয় 'বাকশাল' নামটি বহাল করা কৌশলের খেলাপ মনে করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে শেখ হাসিনার গোটা শাসনামলে তার যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপে বাকশালী মনোবৃত্তি স্পষ্ট। তিনি সংসদকে পাশ কাটিয়ে এবং বিরোধী দলের মতামতের কোন তোয়াক্কা না করে দেশের এক-দশমাংশ এলাকা (পার্বত্য তিনটি জেলা) সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যা সর্বদিক দিয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর বলে দেশবাসী মনে করে। বিশেষ করে অউপজাতি বাংলাদেশীদের ঐ তিন জেলায় নিজ দেশে পরবাসী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং জেলাগুলোকে উপজাতি এলাকা ঘোষণা করে বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য দেশের ঐ অংশে সম্পত্তির মালিক হওয়া ও ধনবান করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একইভাবে ভারতের সাথে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পানিচুক্তি করা হয়েছে।

বাকশালী সংসদ

জাতীয় সংসদকে বাকশালী পদ্ধতিতে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করতে বাধ্য হয় এবং বিনা বাধায় স্বেচ্ছাচারমূলক আইন পাস করা যায়।

স্পিকারকে শেখ হাসিনা পূর্ণ আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য করেছেন। তিনি স্বয়ং এবং তার মন্ত্রীগণ বিরোধীদলীয় নেত্রীসহ বিরোধী দলের প্রতি চরম অশালীন ভাষা ও আপত্তিকর আচরণ করে সংসদ বর্জন করতে বাধ্য করেছেন। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে সংসদে উপস্থিত রাখার আসল দায়িত্ব সরকারের। এতে অক্ষম হলে সরকার চরম ব্যর্থ বলে বিশ্বে গণ্য হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সামান্যতম আস্থাও যে শেখ হাসিনার নেই, তা এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। শেখ হাসিনার আচরণে সে কথাই বোঝা গেল যে, তিনি বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে পরম স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন, যাতে বাকশালী পদ্ধতিতে যে আইন খুশি তা বিনা বাধায় পাস করিয়ে দিতে পারেন। তথাকথিত জননিরাপত্তা আইন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য চরম কলঙ্কের পরিচায়ক। ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব বিরোধী দলীয় নেতাদেরকে বিনা বিচারে আটক করে গণতন্ত্রের যে সর্বনাশ করে গেছেন, শেখ হাসিনা ঐটুকুকেও যথেষ্ট মনে করেননি। কারণ ঐ আইনে যত লোককে গ্রেপ্তার করা হয়, হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করলে সবার আটকাদেশই অবৈধ ঘোষণা হয়ে যায়। তাই রাজনৈতিক বিরোধীদের অন্যায়ভাবে আটক রাখার বাকশালী প্রয়োজন পূরণের জন্য এমন আইন তার দরকার যাতে হেবিয়াস কর্পাসের সুযোগ পাওয়া তো দূরের কথা, জামিন পর্যন্ত যেন না পায়। তাই একদলীয় সংসদে 'জননিরাপত্তা আইন' নামে এক জঘন্য কালাকানুন পাস করা হয়। শেখ হাসিনা আইন শৃঙ্খলার উন্নতির দোহাই দিয়ে সন্ত্রাস দমনের মহান উদ্দেশ্যেই এ আইন করা হচ্ছে বলে দাবি করেন। বিরোধী দল

www.pathagar.com

সংসদের বাইরে থেকে আপত্তি জানায় যে, এ আইন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে।

নিশ্চয়তা দিয়ে শেখ হাসিনা এ আশঙ্কা অমূলক বলে জনগণকে আশ্বাস দিলেন। এ কালাকানুন পাস হওয়ার পর পরই দেখা গেল একদিকে সরকারি দলের মস্তানদের সন্ত্রাস ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল, অপরদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঐ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীকে সন্ত্রাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের পাইকারি হারে আসামী করার ব্যবস্থা নিলেন। ছাত্রদের উপরও এই আইন প্রয়োগ করা হল। এমনকি মাদরাসার নিরীহ ছাত্র ও আলেম সামাজের ওপরে পর্যন্ত সন্ত্রাসী হিসেবে এ আইন প্রয়োগ করে নির্যাতন চালাল।

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে বিনা ওয়ারেন্টে রাত ১২ টায় গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ ডাকাতের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। বায়তুল মোকাররম মসজিদে লোকেরা আশ্রয় নিলে পুলিশ সেখানেও হামলা করে ৫/৬শ' লোককে (সাধারণ মুসল্লীসহ) গ্রেপ্তার করে বাকশালী গণতন্ত্রের নমুনা দেখাল। এ আইনের দাপটে এখনও লক্ষাধিক লোক হয় পলাতক, আর না হয় বিনা বিচারে আটকা পড়ে আছে।

বিচার বিভাগের উপর জঘন্য হামলা

আমাদের দেশে কোন সরকারের আমলেই বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত করার শাসনতান্ত্রিক দাবি পূরণের চেষ্টা করা না হলেও ইতঃপূর্বে কখনও বিচার বিভাগের উপর প্রকাশ্য হামলা করা হয়নি।

স্বাধীন বিচার বিভাগ গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের অন্যতম ভিত্তি। শাসন বিভাগের যুলুম-নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার আইনগত আশ্রয়ই হল বিচার বিভাগ। শেখ হাসিনার আমলেই সর্বপ্রথম হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের উপর জঘন্য হামলা শুরু হয়। এ হামলার উদ্বোধন করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মিথ্যা মামলা দিয়ে যাদের গ্রেপ্তার করা হয় হাইকোর্টে তাদের জামিন দেওয়ায় বিক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী বিচারপতিদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অশালীন ভাষায় মন্তব্য করেন। বিচারপতিদের কাছে সন্ত্রাসীরা আশ্রয় পায় বলে তিনি অভিযোগ করেন। তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হলে সুপ্রীম কোর্ট তাকে সতর্ক ও সংযত হয়ে কথা বলার পরামর্শ দেন। একজন প্রধানমন্ত্রীর জন্য এটা বড়ই লজ্জার বিষয় যে, আদালত থেকে এমন ভর্ৎসনা শুনতে হল।

আদালত তো অশালীন ভাষা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নয়। তাই শেখ হাসিনার মত কটুভাষীর মনে আদালতের সতর্কবাণী সামান্য লজ্জাবোধও সৃষ্টি করতে পারেনি।

www.pathagar.com

তিনি আবারও বিচারকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। আদালত আবারও তাকে ভর্ৎসনা করলেন। আদালতের উপর মনের ঝাল ঝাড়ার জন্য সংসদীয় নিরাপত্তার সুযোগ নিয়ে সংসদ অধিবেশনেই তিনি বিচারপতিদের কঠোর সমালোচনা করলেন। এ বিষয়ে তিনিই বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করতে সক্ষম হলেন।

শেখ মুজিব হত্যা মামলায় কয়েকজন বিচারপতি বিব্রতবোধ করায় মহাবীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য কয়েকজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে এক বিরাট জঙ্গি লাঠি মিছিল হয়। তাতে বিচারকদের হুমকি দেওয়া হয় যে, সঠিক বিচার না করলে কোথায় লাঠি মারতে হবে তা আওয়ামী লীগ জানে।

বিচারপতিদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয় যে, অমুক মাসের মধ্যে মামলার চূড়ান্ত রায় দিতে হবে। কি রায় দিতে হবে সে কথা ঘোষণা করতেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দ্বিধা করেননি। শেখ মুজিব বাকশালী ব্যবস্থায় বিচারপতিদের যে অসহায় অবস্থান নির্ধারণ করেছিলেন, তা-ই শেখ হাসিনার কাছে আদর্শ বলে মনে হওয়ার কারণেই তিনি এবং তার নির্দেশে মন্ত্রীগণ এ ভূমিকা পালন করা কর্তব্য মনে করলেন। চরম স্বৈরশাসকদের দেশেও বিচারপতিদের প্রতি এমন পাশবিক আচরণের কোন নযীর নেই।

সরকারি কর্মকর্তাদের মর্যাদা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচিত সরকার সাময়িক সরকার হিসেবে গণ্য। দলীয় মেনিফেস্টোর ভিত্তিতে নির্বাচনে বিজয়ী দল ক্ষমতাসীন হয়। আমলারা স্থায়ী সরকার। তারা কোন দলের পক্ষ বা বিপক্ষ শক্তির নয়। তারা সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্বশীল। নির্বাচিত সরকার পরিবর্তন হয়। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জনগণের সেবক। যে দলই ক্ষমতাসীন হয় সে দলের মেনিফেস্টো অনুযায়ী সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব তারা পালন করে—এটাই গণতান্ত্রিক রীতি।

গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচিত সরকারের সাথে স্থায়ী সরকারের সম্পর্ক

নির্বাচিত সরকার দলীয় মেনিফেস্টোর পক্ষে জনগণের কাছ থেকে যে ম্যান্ডেট পেয়েছে সে অনুযায়ী সরকার যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা আমলা ও কর্মকর্তারা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। এর ব্যতিক্রম যাতে না হয় সরকার এর তদারকি করবে।

নির্বাচিত সরকার আরও একটা বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য যেসব 'রুলস অব সার্ভিস' এবং 'কোড অব কন্ডাক্ট' রয়েছে তা তারা যথাযথভাবে মেনে চলছে কিনা তা দেখার দায়িত্বও নির্বাচিত সরকারের। সরকারি কর্মকর্তারা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ

www.pathagar.com

পায়। কোন রাজনৈতিক পরিচয় সেখানে ধর্তব্য নয়। নিয়োগ পাওয়ার পর তাদের প্রয়োজনীয় যত রকম ট্রেনিং দেওয়া হয় এর মধ্যে তাদের রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকাও অন্যতম।

নির্বাচিত সরকার স্থায়ী সরকারকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেবে এবং উপরিউক্ত দুটো নীতি অনুযায়ী তদারকি করবে। আমাদের দেশে গণতন্ত্র এ মানে এখনই আশা করা যায় না।

কিন্তু আমলাদের ব্যাপারে সামান্য যেটুকু মান চালু ছিল শেখ হাসিনা তা ধ্বংস করে দিয়ে গেলেন।

চরম স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরশাসন চালু করে সরকারি কর্মচারীদের বাকশালী মন্ত্রে দীক্ষিত করার যে মারাত্মক রীতি শেখ হাসিনা চালু করলেন তারই ফলে কেয়ার-টেকার সরকার বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হল। 'সার্ভিস রুল' ও 'কোড অব কন্ডাক্ট' অমান্য করে সরকারের দেশ ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের পক্ষে কাজ করার জন্য শেখ হাসিনা তাদের বাধ্য করায় তাদের নিরপেক্ষ চরিত্র ধ্বংস হয়েছে। এতে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেশের সর্বনাশ হয়েছে। পরবর্তী নির্বাচিত সরকার যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সক্ষম হন তাহলে এসব মেধাবী ও যোগ্য কর্মকর্তাদের আবার দল-নিরপেক্ষ হিসেবে সংশোধন করা সম্ভব হতে পারে। এরা জাতির সম্পদ। এদের ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করা নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা দেশকে শেখ হাসিনার মত গণতন্ত্রের দুশমন থেকে রক্ষা করুন।

রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ

গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই জনসভা, মিছিল, হরতাল ও প্রতিবাদ করার অধিকার স্বীকৃত। শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে এসব অধিকার তিনি ভোগ করে এসেছেন। ১৯৮৩ সাল থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত দেশে এসব অধিকার মোটামুটি বহাল ছিল। অবশ্যই মাঝে মাঝে অধিকার হরণ করাও হয়েছে।

বিগত হাসিনা সরকারের আমলে দলীয় সন্ত্রাসীদের নেতৃত্বে এবং পুলিশ ও প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় এসব অধিকার ব্যাপকভাবে হরণ করা হয়। বিরোধী দলের আহূত জনসভার স্থলে একই সময় পাল্টা জনসভা ডেকে প্রশাসনকে ১৪৪ ধারা জারির পরিবেশ সৃষ্টি করা একটি জঘন্য পদ্ধতির প্রচলন। এটা শেখ হাসিনারই অনন্য অবদান। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার আগেও তাদের ছাত্র সংগঠন জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে এ আচরণ বহু এলাকায় করেছে।

প্রত্যেক সরকারের আমলেই বিরোধী দল হরতাল ডেকেছে। হরতাল চলাকালে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বহাল রাখার উদ্দেশ্যে রাজপথে পুলিশ ও বিডিআর

www.pathagar.com

মোতায়েন করাতেও হরতাল পালনকারীরা কখনও আপত্তি করেনি। পুলিশ কোন বাড়াবাড়ি না করলে শান্তিপূর্ণভাবেই হরতাল পালনের ঐতিহ্য এ দেশে চালু ছিল।

শেখ হাসিনার আমলে হরতালের বিরুদ্ধে দলীয় ক্যাডারদের নেতৃত্বে এবং পুলিশের ছত্রছায়ায় রাজপথ দখলের বাকশালী পদ্ধতি নতুন করে চালু করা হয়েছে। বিরোধী দলের মিছিলে হামলা, পুলিশের সামনে প্রকাশ্যে গুলী করে হত্যা করা ও মহিলাদের শাড়ি নিয়ে টানা-হেঁচড়া করার মত ঘটনা পূর্ববর্তী কোন সরকারের আমলেই ঘটেনি। শেখ হাসিনার সশস্ত্র ক্যাডারদের জঙ্গি মিছিলে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক মনোভাব লক্ষণীয় ছিল। বাকশালী গণতন্ত্র চালুর এ অপচেষ্টা ইতিহাস হয়েই রইল।

গড়ার নয়, ধ্বংসের যোগ্যতা

গণতান্ত্রিক বিশ্বে এ কথা স্বীকৃত যে, সরকারের কাজ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করা, এর এক বিভাগকে অপর বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করতে না দেওয়া, কোন বিভাগ যাতে ক্ষমতা ব্যবহারে বাড়াবাড়ি করতে না পারে সেজন্য এই তিন বিভাগের সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় রাখা; সর্বোপরি বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখা গণতন্ত্রের অবাধ বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার আগেও দেশে উপরিউক্ত গণতান্ত্রিক মান যথাযথভাবে কায়েম ছিল না। মাত্র ১৯৯১ সাল থেকে নতুন করে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু হয়। '৯৬ সাল থেকে আমাদের এ পথে অগ্রসর হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এ ব্যাপারে সামান্য যেটুকু মান ছিল তাও শেখ হাসিনা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে গেলেন। তিনি আইনসভাকে একদলীয় (বাকশালী) সংস্থায় পরিণত করলেন। শাসন ক্ষমতাকে স্বৈর পদ্ধতিতে পরিচালনা করে জাতীয় সংসদকে দলীয় রাজনীতির আখড়ায় পরিণত করেন। পল্টনী ভাষায় বক্তৃতা করে সংসদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করলেন।

প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীকে শেখ হাসিনা দলীয় ক্যাডার হিসেবে ব্যবহার করে শাসন বিভাগের মান চরমভাবে বিনষ্ট করেছেন। আর বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের আজ্ঞাবহ বানানোর অপচেষ্টার ফলে আইনের শাসন বলতে আর কিছু অবশিষ্ট রইল না। এসব কথাই প্রমাণ করে যে, শেখ মুজিব ও শেখ কন্যা দেশ গড়ার কাজে কোন যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হননি। তারা ভাঙার যোগ্যতা নিয়েই রাজনীতি করেছেন।

আগামী নির্বাচনের পর এমন সরকার কায়েম হোক যারা দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে পুনর্বহালের উদ্দেশ্যে যা করণীয় তা করার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে সক্ষম হবেন। ধ্বংসের যে ধারা চলে এসেছে তা রোধ করে দেশকে গড়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত সরকার চাই।

www.pathagar.com

তৃতীয় সর্বনাশ ঃ ইসলামকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র

ইসলামকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে শেখ হাসিনা হজ্জ ও ওমরাহ করেন। পত্রিকা ও টেলিভিশন থেকে তা জানা যায়। হজ্জ-ওমরাহ করলে তো নামায অবশ্যই পড়তে হয়। তিনি হয়তো ৫ ওয়াক্ত নামাযও পড়েন এবং রোযাও রাখেন।

আমার প্রশ্ন হল, তিনি নামায-রোযা-হজ্জ করেন কার হুকুমে? নিশ্চয়ই আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যেই এসব করেন। এসব হুকুম তিনি কোথায় পেলেন? নিশ্চয়ই তিনি বলবেন যে, কুরআন থেকে পেয়েছেন। এখন আমার প্রশ্ন হল, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব হুকুম করেছেন সেসব মানতে তিনি অস্বীকার করেন কোন যুক্তিতে? তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী বলে দাবি করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কী? গোটা বিশ্বে এর অর্থ নিম্নরূপ– ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। যার যে ধর্ম খুশি পালন করুক। ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনা চলবে না। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শাসন পদ্ধতি, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। এসব ব্যাপারের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

শেখ হাসিনা যে এ ধর্মনিরপেক্ষ মতাবাদেই বিশ্বাসী তা তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবেই ঘোষণা করেছেন। শেখ মুজিব আমলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শাসনতন্ত্রে জাতীয় আদর্শ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলেও ১৯৭৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে তা উৎখাত হয়ে যায়।

ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানবিরোধী, অথচ শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেই শাসনতন্ত্রবিরোধী এ মতবাদকে জবরদস্তিমূলকভাবে জাতির উপর চাপিয়ে দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের সরাসরি সাহায্য এবং রাশিয়ার পরোক্ষ সহযোগিতার ফলে শেখ মুজিব হয়তো বাধ্য হয়ে ভারতের চাপে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে এবং রাশিয়ার চাপে সমাজতন্ত্রকে শাসনতন্ত্রে জাতীয় আদর্শ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হন। এদেশের মাটিতে চরম ইসলামবিরোধী এ দুটো মতবাদের কোন শিকড় না থাকায় ১৯৭৭ সালে এ দুটোই শাসনতন্ত্র থেকে উচ্ছেদ হয়ে যায়। শেখ হাসিনার দলের ম্যানিফেস্টোতে এ দুটো মতবাদ না থাকলেও জনগণকে ধোঁকা দিয়ে তিনি ক্ষমতায় এসে ধর্মনিরপেক্ষতা চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালান।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ চরম কুফরী মতবাদ। ইবলিস আল্লাহর একটি হুকুমকে মানতে অস্বীকার করায় আল্লাহ তাকে কাফের ও অভিশপ্ত ঘোষণা করলেন। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আল্লাহর অগণিত হুকুমকে মানতে অস্বীকার করার নামান্তর। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যত হুকুম কুরআনের আছে তা সবই মানতে অস্বীকার করা হচ্ছে

www.pathagar.com

ঐ মতবাদে। এর চাইতে বড় কুফরী মতবাদ আর কী হতে পারে? শেখ হাসিনা যদি কুরআনে বিশ্বাসী বলে দাবি করেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল বলে স্বীকার করেন, তাহলে কেমন করে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাস করতে পারেন?

শুধু নামায-রোযা-হজ্জের হুকুম মানা, আর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্দেশনাকে মান্য করতে অস্বীকার করার অধিকার তিনি কোথায় পেলেন? তার তা জানা উচিত যে, আল্লাহর একটি হুকুম মানতে অস্বীকার করাও কুফরী।

তাহলে তার হজ্জ ও ওমরাহ কি রাজনৈতিক অভিনয়?

আল্লাহ পাক কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ ও রাসূলের কোন নির্দেশ মানতে অস্বীকার করার কোন অধিকার কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর নেই। হুকুম হিসেবে স্বীকার করে কোন দুর্বলতার কারণে না মানলে কাফের হয় না, ফাসেক হয়। কিন্তু মানতে অস্বীকার করলে অবশ্যই কাফের হয়।

যদি অজ্ঞতার কারণে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে ঈমানের স্বার্থে তা অবিলম্বে ত্যাগ করুন। কিন্তু আল্লাহর সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক হুকুমকে মানতে অস্বীকার করে শুধু ধর্মীয় কয়েকটি হুকুম পালন করা হলে এ কথা না বলে উপায় নেই যে, তিনি রাজনৈতিক অভিনয় হিসেবেই হজ্জ ও ওমরাহ পালন করেন। ১৯৯৬-এর নির্বাচনের আগে হজ্জ করে তিনি ইহরামের পট্টি মাথায় বেঁধে এবং হাতে তসবীহ নিয়ে বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। গোটা নির্বাচনী অভিযানে তিনি পট্টির প্রদর্শনী করেন। প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের সময়ও হাতে তসবীহ ও মাথায় পট্টি ছিল।

গত পাঁচ বছর ইসলামের বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ করেও এবারের নির্বাচনের আগে ওমরাহ করতে গেলেন। এবারও পট্টি মাথায় নিয়েই নির্বাচনী অভিযান চালাচ্ছেন।

শেখ হাসিনার এ ভূমিকাকে জনগণ কিভাবে গ্রহণ করবে? যদি আল্লাহর নির্দেশ হিসেবেই তিনি হজ্জ ও ওমরাহ পালন করেন তাহলে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী শাসন করতে অস্বীকার কেন করেন? সূরায়ে মায়েদায় আল্লাহ বলেছেন যে, 'যারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী শাসন করে না তারা যালেম, ফাসেক ও কাফের।' এ অবস্থায় তার হজ্জ ও ওমরাহ পালনকে রাজনৈতিক অভিনয় বলা ছাড়া উপায় থাকে না।

শেখ হাসিনা মাদরাসা ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন কেন?

শেখ হাসিনা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেন যে, মাদরাসায় যারা কুরআন-হাদীস-ফেকাহ থেকে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে, তারা কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হতে রাজি হবে না। তাই মাদরাসা পাস ছাত্রদেরকে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা হবার সুযোগ দেওয়া হয় না। তাদেরকে প্রতিযোগতামূলক পরীক্ষার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে

www.pathagar.com

না। তাদের উচ্চ ডিগ্রীকে বিএ ও এমএ ডিগ্রীর সমমর্যাদা দেওয়া হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় সকল বিষয়ে তাদেরকে ডিগ্রী নিতে দেয় না। কারণ মাদরাসায় পড়া ছাত্ররা যদি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হয় এবং সামরিক ও বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী হয় তাহলে তারা কোনদিন ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ গ্রহণ করবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মতে, মাদরাসা শিক্ষা তাদের তথাকথিত আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণ শিক্ষা তো ইংরেজ আমল থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে চলে এসেছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ ও ইসলামী ইতিহাস বিভাগকে শেখ হাসিনার শাসনামলে অনেক সংকুচিত করা হয়েছে। নানা অজুহাত সৃষ্টি করে অনেক মাদরাসার অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাদরাসার অঙ্গনে কখনো সন্ত্রাস ছিল না। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে যে মারামারি লেগেই থাকে মাদরাসায় এর কোন অস্তিত্বই নেই। বোমার সামান্য চর্চাও কোন মাদরাসায় হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। অথচ বিভিন্ন স্থানে বোমা বিস্ফোরণ ও বোমা পুঁতে রাখার ঘটনাকে অজুহাত বানিয়ে মাদরাসায় তালেবান বাহিনী, লাদেন বাহিনী ও হারকাতুল জিহাদ আবিষ্কার করে মাদরাসা ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসবের একমাত্র উদ্দেশ্য ইসলামী শিক্ষা ধ্বংস করা ও জনগণের মধ্যে আলেম সমাজের ভাবমর্যাদা বিনষ্ট করা। অথচ আজ পর্যন্ত কোথাও কোন প্রমাণ বের করতে পারেনি যে, মাদরাসা ও আলেমগণ এসবের সাথে জড়িত।

তথাকথিত মৌলবাদী গালি

জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দল যারা আল্লাহর আইন বা ইসলামী খিলাফত কায়েম করে রাসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে বাংলাদেশে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলনে সক্রিয়, তাদের সবাইকে প্রতিহত করার হীন উদ্দেশ্যে তাদেরকে মৌলবাদী আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ পরিভাষাটি খ্রিস্টধর্মের সাথে সম্পর্কিত। অথচ এটা একটা গালি হিসেবে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে। ইসলামের স্বার্থে যা কিছুই করা হোক তাকে সাম্প্রদায়িকতা অভিধায় নিন্দা করা হয়। যারা এ দেশকে বিভক্ত করে হিন্দু রাষ্ট্র কায়েমের হুমকি দেয় এবং মা কালীর দরবারে 'ফতোয়াবাজ'দেরকে বলি দিতে চায়, তারা শেখ হাসিনার প্রশ্রয়ে চরম সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে। অথচ ইসলামী দলগুলোকে ঐসব সাম্প্রদায়িক শক্তির মুখেই সাম্প্রদায়িক গালি শুনতে হয়েছে।

শেখ হাসিনার ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের পথে সবচেয়ে বড় বাধাই হল ইসলামী আন্দোলন। এ আন্দোলনের কারণেই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ জনগণের মধ্যে শিকড় গাড়তে পারছে না। তাই শেখ হাসিনা তথাকথিত জননিরাপত্তা আইনের যাঁতাকলে ইসলামী আন্দোলনকে পিষে মারার চেষ্টা করেছেন।

www.pathagar.com

ফতোয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ

ইসলামে ফতোয়ার মর্যাদা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তথা ইসলাম সম্পর্কে মূর্খ এক বিচারপতি ফতোয়ার বিরুদ্ধে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুয়োমটো মামলা দায়ের করে চরম ইসলামবিরোধী রায় দিয়ে শেখ হাসিনার মন জয় করে ফেললেন। এর পুরস্কারস্বরূপ ঐ বিচারককে সিনিয়র যোগ্যতর বিচারপতিকে ডিঙিয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রমোশন দিয়ে শেখ হাসিনা সর্বোচ্চ আদালতে এবং আইনজীবীদের মধ্যে বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলেন। ঐ বিচারপতির ইসলামবিরোধী রায়ের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র আলেম সমাজ চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ইসলামের জন্য জান কুরবান করতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফলে জনগণের নিকট শেখ হাসিনা ইসলামের দুশমন হিসেবেই পরিচিত হলেন। বিচারপতির ঐ রায় অবশ্য বর্তমানে স্থগিত আছে। এখনো বাতিল হয়নি। তাই এ রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনও বন্ধ হতে পারেনি। শেখ হাসিনা ফতোয়া নিয়ে এভাবে বাড়াবাড়ি করে এ কথাই প্রমাণ করলেন যে, যদি আবার ক্ষমতায় আসতে পারেন তাহলে এ দেশ থেকে ইসলামী আন্দোলনকে উৎখাত করে এখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই কায়েম করে ছাড়বেন। যদি কেয়ার-টেকার সরকার আগামী নির্বাচন সন্ত্রাসমুক্ত, অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করতে পারেন তাহলে ইসলামে বিশ্বাসীদের ভোট তিনি পাবেন না। আল্লাহ তায়ালা ইসলামের দুশমন থেকে এ দেশকে হেফাজত করুন।

চতুর্থ সর্বনাশ ঃ আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ধ্বংস করা

একথা বিশ্বে সর্বজন স্বীকৃত যে, জনগণের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হিফাজতের উদ্দেশ্যে আইন-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে বহাল রাখাই সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। যে সরকার এ প্রাথমিক কর্তব্য পালন করে না এমন সরকারের কোন দরকার থাকতে পারে না।

শেখ হাসিনার অন্ধ ভক্তদের কথা আলাদা। তাদের কথা বাদ দিয়ে দেশের কোটি কোটি মানুষ এ কথার প্রত্যক্ষ সাক্ষী যে, দেশে যতটুকু আইন-শৃঙ্খলা কায়েম ছিল তা হাসিনা সরকার সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছেন। সকলেই এর সরাসরি ভুক্তভোগী বলে একথা প্রমাণ করার জন্য দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। এ কথার প্রমাণ হিসেবে একটি উদাহরণই যথেষ্ট।

কেয়ার-টেকার সরকারপ্রধান শপথ নেবার পরদিন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনে যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে তিনি দেশে আইন-শৃঙ্খলা পুনর্বহাল করার উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে বিরাট দায়িত্ব তিনি নিলেন তা পালনে সফল হতে হলে আইনশৃঙ্খলা কায়েম করাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন। কূটনীতিকবৃন্দ ও দাতা দেশসমূহ আইন-শৃঙ্খলা বহাল করার ব্যাপারে আগ থেকেই তাগিদ দিচ্ছেন। ১৫ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়

www.pathagar.com

প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণের মুহূর্ত পর্যন্ত শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর ২৪ ঘণ্টা পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধান উপদেষ্টাকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তার প্রথম ভাষণেই আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে এত গুরুত্বের সাথে বক্তব্য রাখতে হল কেন? তাকে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে এত পেরেশান হতে হল কেন? শেখ হাসিনার সফল গণতান্ত্রিক সরকারের সুশাসনের কোন স্বীকৃতি কেউ দিচ্ছে না কেন? প্রধান নির্বাচন কমিশনার অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করার জন্য মাসখানিক আগে পুলিশ ও প্রশাসন কর্মকর্তাদের নিকট দাবি জানালে তারা কেয়ার-টেকার সরকার কায়েমের পূর্বে তা সম্ভব নয় বলে কেন মন্তব্য করলেন? কেয়ার-টেকার সরকারপ্রধান শপথ নেবার পরই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জওয়াবে বললেন, 'আইন-শৃঙ্খলা বহাল করার উপরই আমি সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেব।

শেখ হাসিনা সবসময় দাবি করে এসেছেন যে, তিনি সন্ত্রাস দমন করে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি সাধন করেছেন। তিনি এবং তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকল বোমাবাজি, হত্যা ও সন্ত্রাসের জন্য চারদলীয় জোটকে দায়ী করে প্রতিটি সন্ত্রাসী ঘটনা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের হীন উদ্দেশ্যে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদেরকে আসামী করে মামলা দিয়ে হয়রানি করেছেন। সকল মহলের অবিরাম দাবি সত্ত্বেও এতগুলো নৃশংস বোমা বিস্ফোরণের কোনটিরই বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হল না কেন? সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা হত্যার একটি ঘটনারও তদন্ত করে অপরাধীদেরকে শনাক্ত করতে সক্ষম হলেন না কেন?

দেশের সবাই জানে যে, যাদেরকে মৌলবাদী বলে গালি দেওয়া হয় তারা বোমাবাজি দূরের কথা, রাজনৈতিক সংঘাতের ধারে-কাছেও যান না। অথচ সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটার সাথে সাথে শেখ হাসিনা ও তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মৌলবাদীদেরকে দায়ী ঘোষণা করেন। নিরপরাধ লোকদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের বর্বর প্রচেষ্টা চলে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীকে শেখ হাসিনা সন্ত্রাস দমনের জন্য ব্যবহার না করে তার সন্ত্রাসী গডফাদারদের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য করেছেন। হাজারী, তাহের ও শামীম মার্কা যোগ্য গডফাদার যোগাড় করতে পারলে সব জেলা শহরেই ডিসি ও এসপিদেরকে ফেনী, লক্ষ্মীপুর ও নারায়ণগঞ্জের মতই ব্যবহার করার ব্যবস্থা তিনি করতেন। শেখ হাসিনা এ জাতীয় গডফাদারদের প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তাদের পিঠ চাপড়িয়ে জনসভায় বাহবা দিয়েছেন এবং তাদের মত যোগ্য লেফটেন্যান্ট পেয়ে গর্ববোধ করেছেন।

তার কুশাসনের শেষ ক'মাসে তিনি তার সন্ত্রাসী বাহিনীকে বৈধ অস্ত্রেও সুসজ্জিত করার ব্যবস্থা করেছেন। ছাত্র ও যুবকদেরকে লাইসেন্স দিয়ে অস্ত্রধারণ করার মত জঘন্য ব্যবস্থা কি আইন-শৃঙ্খলা ধ্বংসের নীল নকশা নয়? শেখ হাসিনা কেয়ার-টেকার সরকারের জন্য অত্যন্ত কঠিন পরিবেশ রেখে গেলেন। মনে হয় তার ধারণা

www.pathagar.com

ছিল যে, পুলিশ ও প্রশাসনকে তিনি ব্যালট ডাকাতির উদ্দেশ্যে যেভাবে বিন্যস্ত করেছেন, কেয়ার-টেকার সরকার সে ছক মোতাবেকই কাজ করতে বাধ্য। এ ধারণা করার কারণেই নির্বাচনে তিনি ও তার বংশবদ মন্ত্রীরা এত জোর দিয়ে দাবি করেছেন যে, নির্বাচনে তারা অবশ্যই বিজয়ী হবেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান দীর্ঘকাল বিচারপতি ছিলেন। প্রধান বিচারপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। দেশের সংবিধান তার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে তা যথাযথভাবে পালন করার উপরই যে জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তা উপলব্ধি করা তার জন্য খুবই স্বাভাবিক।

তার এ মহান দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগকে তার মত করে সাজানো অপরিহার্য। শেখ হাসিনা তার কুমতলবে সচিবের পদে যাকে যেখানে বসিয়ে গেছেন তাদেরকে বদলি করার সাথে সাথে তিনি যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তা থেকেই তার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দাবি করেছেন যে, নির্বাচিত সরকার হিসেবে তিনি যা করেছেন এর উপর হাত দেবার কোন অধিকার কেয়ার-টেকার সরকারের নেই। এমনকি সচিবদেরকে বদলি করাকেও তিনি বেসামরিক অভ্যুত্থান বলতে পারলেন।

সারাদেশের পরিস্থিতি কী বলে? কেয়ার-টেকার সরকার প্রধানের ১৫ জুলাই সন্ধ্যায় শপথগ্রহণের একঘণ্টার মধ্যে ১৩ জন সচিবকে বদলি করা, এর ১৪ ঘণ্টা পরই ১০ জন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ উপদেষ্টা নিয়োগের ব্যবস্থা করা, এর মাত্র নয় ঘণ্টা পর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে চমৎকার ভাষণদান এবং উপদেষ্টাদের শপথের পরপর প্রথম বৈঠকেই কতক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে হাসিনার মন্ত্রিসভায় গৃহীত শেষ তিন মাসের সিদ্ধান্তসমূহ স্থগিত করাও একটি। এ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আওয়ামী মহল ছাড়া সকলকেই আশ্বস্ত করেছে। জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়েছে। ৫ বছর আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে থাকার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে উল্লসিত হয়ে গ্রামেগঞ্জে পর্যন্ত জনগণ নাজাতের উৎসব পালন করেছে। সিন্দাবাদের দৈত্যের মত জাতির গর্দানে চেপে বসা অপশক্তির অপসারণে গোটা পরিবেশে পরিবর্তনের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। দেশবাসী বিটিভির সংবাদ কয়েক বছর পর ১৫ জুলাই থেকে দেখার যোগ্য মনে করেছে।

শেখ হাসিনা নির্বাচিত সরকার ও কেয়ার-টেকার সরকারের মর্যাদা ও ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্যের যে বাহানা তালাশ করছেন তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। নির্বাচিত সরকারের মতই কেয়ার-টেকার সরকারও সাংবিধানিক মর্যাদার অধিকারী। এ সরকারের উপর মাত্র ৮৮ দিনের মধ্যে (দু'দিন হাসিনা অন্যায়ভাবে নষ্ট করেছেন) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সংবিধান যে পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা যথাযথরূপে

www.pathagar.com

পালনের জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণের বৈধ অধিকার এর আছে। যদি এ সরকারের কোন সিদ্ধান্ত সংবিধানবিরোধী হয় তা হলে উচ্চ আদালতে অভিযোগ করার অধিকারও হাসিনার আছে এবং পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের তা বাতিল করারও ক্ষমতা থাকবে।

শেখ হাসিনা হুমকি দিয়েছেন যে, তার মর্জির খেলাফ কেয়ার-টেকার সরকার কিছু করলে তিনি মেনে নেবেন না। তিনি বর্তমানে যে অবস্থানে আছেন সেখান থেকে হুমকি দেওয়া যে হাস্যকর সে কথা উপলব্ধি করার যোগ্যতাও তিনি হারিয়েছেন। তার এ দাম্ভিকতা প্রদর্শন কৌতুকের বিষয় হয়েই থাকবে।

পঞ্চম সর্বনাশ ঃ জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি

মজবুত আইন শৃঙ্খলা বহাল রেখে জনগণের জান-মাল-ইজ্জতের হেফাজত করা যেমন সরকারের প্রধান দায়িত্ব, তেমনি সমাজে শান্তিময় পরিবেশ কায়েম করে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি নির্মাণ করা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। শেখ হাসিনা আইন শৃঙ্খলা ধ্বংস করার সাথে সাথে জাতীয় ঐক্যকেও চরমভাবে বিনষ্ট করেছেন। উৎপাদনের গতি অব্যাহত রাখা এবং সকল দিক দিয়ে দেশকে গড়ে তুলবার জন্য জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরী। দেশ গড়ার কাজে জনগণের সর্বমহলের সহযোগিতা সরকারের বিশেষ প্রয়োজন। জনগণের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি ছাড়া এ প্রয়োজন কিছুতেই পুরা হতে পারে না।

এ কারণেই দেখা যায়, সব দেশে, সব কালেই যেসব জাতীয় নেতা সত্যিকার আন্তরিকতা নিয়ে দেশ গড়ার চেষ্টা করেছেন তারা ক্ষমতা গ্রহণের পর অতীতের সকল ভেদাভেদ, বিদ্বেষ, লড়াই ইত্যাদি ভুলে সবাইকে আপন করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছেন।

কয়েকটি উদাহরণ

১. হিজরী অষ্টম সালের রমযান মাসে রাসূল (স) বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করার পর দীর্ঘ ২১ বছর যারা চরম দুশমনি করেছে তাদেরকেও ক্ষমা করে দিলেন। দুশমনদের প্রধান নেতা আবূ সুফিয়ানও রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান এনে ক্ষমার প্রতিদান দিলেন। জনগণও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করল। বিরোধীদের শাস্তি দিতে চাইলে তিনি তাতে সক্ষম হতেন। তাদের হৃদয় জয় করে যে মহা সাফল্য অর্জন করলেন তা শাস্তির মাধ্যমে কখনও সম্ভব হত না। তিনি এমন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন যা চিরকাল বিজয়ীদেরকে পথ দেখাচ্ছে।

২. ১৯৪০-এর দশকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক সংঘাতময় বিরোধের ফলে গোটা উপমহাদেশে জনগণের মধ্যে চরম উত্তেজনা ও বিভেদ সৃষ্টি হল।

www.pathagar.com

'৪৭-এর ১৪ আগস্ট ইংরেজ ও কংগ্রেসের সম্মতির ফলে ১০ কোটি মুসলমানের প্রাণের দাবি স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হবার পর রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১১ সেপ্টেম্বর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব অনুভব করে ঐতিহাসিক ঘোষণা দিলেন। তিনি বললেন যে, পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিম ও অন্য সবাই এখন এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। আমরা সবাই পাকিস্তানি জাতি।

কংগ্রেস নেতা কামিনী কুমার দত্ত কেন্দ্রে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আইনমন্ত্রী হলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থমন্ত্রী হয়ে অতীতের বিভেদ ভুলে গেলেন। বিভক্ত ভারতে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ বন্ধ করার জন্য মিঃ গান্ধী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের অপরাধে নাথুরাম গডশে নামক এক উগ্র হিন্দুবাদী তাকে হত্যা করে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু যদি কায়েদে আযমের মত হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ডাক দিতে সক্ষম হতেন তাহলে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা এভাবে অব্যাহত থাকত না। ভারতে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা অবিরাম চলতে থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানে তেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। শেরে বাংলা ফজলুল হক ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপক হয়েও শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নির্বাচন করলেন। মুসলিম লীগ থেকে ১৯৪৩ সালেই তিনি বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে শেরে বাংলা এর চরম বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তাকে পাকিস্তানের স্থায়ী দুশমন মনে করা হয়নি।

৩. দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবাদী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আদিবাসী কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধিকার আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ড. নেলসন ম্যান্ডেলা ২৯ বছর শ্বেতাঙ্গদের কারাগারে নির্যাতিত হন। বিরাট জনসমর্থন নিয়ে তিনি আন্দোলনে বিজয়ী হন। শ্বেতাঙ্গ নেতারা বাধ্য হয়ে ড. ম্যান্ডেলার বিজয়কে মেনে নেয়।

ড. ম্যান্ডেলা যদি তার প্রিয় দেশকে গড়ে তুলবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে দেশ থেকে শ্বেতাঙ্গদের তাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের পূর্ণ সমর্থন তিনি পেতেন। যদি তিনি সে পথে যেতেন তাহলে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারতেন। তার খাঁটি দেশপ্রেম তাকে সে পথে যেতে দেয়নি। দেশ গড়ার মহান উদ্দেশ্যে তিনি শাসন ক্ষমতায় শ্বেতাঙ্গদের শরীক করে নোবেল পুরস্কারের গৌরব অর্জন করলেন।

৪. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পাক বাহিনীর পরাজয়ের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল। যাদের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী বলে ধারণা করা হল তাদের বিচার করার জন্য নতুন আইন তৈরি করে হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হল।

www.pathagar.com

কিছুদিন পর শেখ মুজিব অনুভব করলেন যে, দেশকে গড়ে তুলবার জন্য এ আইন সহায়ক হচ্ছে না। তাই তিনি ঐ আইন বাতিল করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন এবং গ্রেপ্তারকৃতদের জেল থেকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু তার ডিক্টেটরি মনোভাবের কারণে এবং তার দলীয় লোকদের অগণতান্ত্রিক ভূমিকার দরুন তিনি জাতীয় ঐক্য নির্মাণ করতে পারেননি।

জাতীয় ঐক্যের প্রচেষ্টা

এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধার ধুঁয়া তুলে জনগণকে বিভক্ত করার যে চর্চা ৭২ সাল থেকে চলছিল তা দেশ গড়ার পথে বিরাট বাধা ছিল।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে শেখ মুজিব বাকশালী শাসনের অবসানের পর প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুশতাক আহমদ দেশবাসীর মুসলিম চেতনা জাগ্রত করে পরিস্থিতি শান্ত রাখার চেষ্টা করেন। তার তিন মাসেরও কম সময়ের শাসনকালে জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে তুলবার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। একটি সফল সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দকার মুশতাক প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে আরেকটি অভ্যুত্থানের ফলে মুশতাক সরকারের পতন হয়। কিন্তু দ্বিতীয় অভ্যুত্থানটি সফল না হওয়ায় এক চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

মুসলিম চেতনায় উদ্বুদ্ধ সৈনিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না হওয়ায় আল্লাহর রহমতে দেশ গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পায়। ৭ নভেম্বর এক অলৌকিক ঘটনার মত সিপাহী-জনতার এক অদ্ভুত বিপ্লবের মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হন।

তিনি অত্যন্ত সাবধানে ও ধীরগতিতে ক্ষমতায় স্থিতিশীল হবার পর ৭৭ সালে শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনীর ব্যবস্থা করেন এবং গণভোটের মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করেন। '৭৯-র ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধার বিভাজন পরিত্যাগ করে তার দলীয় নীতির ভিত্তিতে দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন দেন। তার মন্ত্রিসভায় উভয় রকমের লোকই গ্রহণ করেন। এমনকি তিনি এমন একজনকে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদীয় দলের নেতা মনোনীত করেন, যিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ইয়াহইয়া সরকারের পক্ষে জাতিসংঘ প্রতিনিধ দলের সদস্য ছিলেন। তিনি শাহ আযীযুর রহমান। জিয়াউর রহমান দেশ গড়ার ব্যাপারে যেটুকু অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন এর অন্যতম কারণ জাতীয় ঐক্য গঠনে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা।

শেখ হাসিনার ভূমিকা

'৯৬-এর জুনের নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনা হজ্জ করতে যান। মাথায় ইহরামের রুমাল ও হাতে তসবীহ নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। গোটা নির্বাচনী অভিযানে তিনি ইহরামের পট্টি পরে থাকেন। শেখ মুজিবের '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্তকার দুঃশাসনের

www.pathagar.com

কথা জনগণ ভোলেনি বলে '৯১-এর নির্বাচনে তার দল ক্ষমতাসীন হতে পারেনি মনে করেই '৯৬-এর নির্বাচনী অভিযানে তার পিতার শাসনের ভুল-ত্রুটি মাফ করার কাতর আবেদন জানিয়ে একটি বারের জন্য জনগণের খেদমত করার সুযোগ দেওয়ার আকুল আবেদন জানান। এ নির্বাচনী অভিযানে '৯১-এর মত কারও প্রতি কটু কথা বলেননি। তার স্বভাবসুলভ কঠোর ভাষাও প্রয়োগ করেননি। জনগণের মন জয় করার জন্য এভাবেই তিনি অভিনয় করেন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ভোটারদের বিরাট সংখ্যায় এমন লোক ছিল যারা শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের স্বৈর দুঃশাসনের সময় অল্প বয়সের ছিল বলে সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। আওয়ামী শাসন কী চিজ তা না দেখার কারণে শেখ হাসিনার নির্বাচনী অভিযানে তার সার্থক অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে অনেকেই হয়তো নৌকায় ভোট দিয়ে থাকবে।

এত কিছু করা সত্ত্বেও ভোটারদের শতকরা ৬৩জন তাকে ভোট দেয়নি। জাল ভোট ও ব্যালট ডাকাতি করার পরও মাত্র শতকরা ৩৭টি ভোট সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এরপরও এরশাদের সমর্থন ছাড়া ক্ষমতাসীন হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এরশাদের সমর্থন নিয়ে মহিলা আসনের বিরাট সংখ্যক দখল করায় সংসদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। এভাবে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পাঁচ বছর শেখ হাসিনা চরম দম্ভসহকারে প্রতিটি বক্তৃতায় নির্বাচিত সরকার হিসেবে গৌরব প্রকাশ করেছেন। এ অহঙ্কার ও গৌরবের দাপটে তিনি পরবর্তী নির্বাচনে আবার ক্ষমতাসীন হবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি অপকৌশল অবলম্বন করেছেন ঃ

স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের ধুঁয়া

শেখ হাসিনা জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে দেশবাসীকে এ ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন যে, যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা স্বাধীনতাবিরোধী।

মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে তিনি সারা দেশে এ অপপ্রচারে তাদের নিয়োগ করেন। শেখ হাসিনা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী। আর এ দেশের সকল ইসলামী মহল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে চরম কুফরী মতবাদ বলে বিশ্বাস করে। তাই ইসলামপন্থিদের যারা রাজনীতিতে সক্রিয় তাদেরও স্বাধীনতাবিরোধী বলে তিনি অপপ্রচার চালাচ্ছেন।

অথচ জনগণ স্বাধীনতার পক্ষে ও বিপক্ষে কারা সে কথা মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিতে বিচার-বিবেচনা করে না। ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা ও নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধের পর ভারতের আধিপত্যের নিশ্চিত আশঙ্কায় যারা মুক্তিযুদ্ধে শরীক হতে পারেননি তাদেরকে জনগণ স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বলে মোটেই মনে করে না। ভারত যে আমাদেরকে সত্যিকার স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে ঐ কাজ করেনি এ কথা শেখ হাসিনার দলেরও অনেকেই উপলব্ধি করেন।

www.pathagar.com

জনগণ ভারতকে বাংলাদেশের বন্ধু মনে করে না। কারণ এ দেশের উপর হামলা হলে একমাত্র ভারত থেকেই হওয়ার আশঙ্কা। ১৯৪৭ থেকে এ ভূ-খণ্ডের প্রতি ভারতের এ পর্যন্তকার আচরণ এ কথাই প্রমাণ করে যে, এদেশের অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও সংস্কৃতির উপর আধিপত্য কায়েম রাখতে তারা বদ্ধপরিকর। এ দেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' কত ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে এ আধিপত্যকে সম্প্রসারণ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত তা এ দেশের সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা বিভাগের ৭ জন কর্মকর্তার বক্তব্য দৈনিক ইনকিলাবে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ কথা কে না জানে যে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের বিদ্রোহ করার সামগ্রিক ব্যবস্থা ভারতই করেছে। শেখ হাসিনা ভারতের নির্দেশেই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের তৈরি সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

এ সত্ত্বেও শেখ হাসিনা ভারতকে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু বলে দাবি করতে দ্বিধা করেন না। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের সাথে সুসম্পর্ক দেশের সবাই চায়।

বাংলাদেশের সীমান্তে শেখ হাসিনার শাসনামলেই ভারত সবচেয়ে বেশি দুশমনির পরিচয় দিয়েছে। এ অবস্থায় জনগণ কেমন করে ভারতকে বন্ধু বলে মনে করতে পারে? তাই শেখ হাসিনাকেও জনগণ ভারতের বন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি মনে করতে বাধ্য।

জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার বিপরীতে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা করে শেখ হাসিনা এ দেশের যে সর্বনাশের চেষ্টা করেছেন তা থেকে জনগণকে রক্ষার মহান উদ্দেশ্যেই চারদলীয় ঐক্য গঠিত হয়েছে। শেখ হাসিনার এত বড় ধৃষ্টতা যে, এ জোটকে পর্যন্ত স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বলতে দ্বিধাবোধ করেন না। তাদের ভারত বন্ধু এ দেশ আক্রমণ করলে তারা স্বাধীনতার জন্য জীবন দেবে বলে কি জনগণ বিশ্বাস করে? গত এপ্রিল মাসে ভারতের সীমান্ত বাহিনী কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীর বড়াই বাড়ীর উপর হামলা করলে বিডিআর-এর দেশপ্রেমিক বাহিনী আক্রমণকারীদের বীর বিক্রমে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। দেশের সর্বস্তরের জনগণ বিডিআর-এর বীরত্বে গর্ববোধ করেছে। আর শেখ হাসিনা তার বন্ধু দেশের বাহিনীর ১৬ জনকে হত্যা করার 'অপরাধের' জন্য বাজপেয়ীর কাছে ক্ষমা চেয়ে বাংলাদেশের কপালে কলঙ্ক লেপন করলেন। শেখ হাসিনা ক্ষমতা হারানোর শেষ পর্যায়ে বিডিআর প্রধানকে রৌমারীর 'ধৃষ্টতার' শাস্তিস্বরূপ ঐ পদ থেকে অপসারণ করে বন্ধু দেশকে (প্রভু?) সন্তুষ্ট করলেন। তিনি কি তাহলে বলতে চান যে, তিনি এবং তার দল ছাড়া দেশের আর সব মানুষ স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি?

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

শেখ হাসিনার পাঁচ বছরের স্বৈরশাসনের শুরু থেকেই তিনি সকল বিরোধী দলের উপর চরম সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যাতে তার

www.pathagar.com

কুশাসনের বিরুদ্ধে কেউ কোন আওয়াজই তুলতে না পারে। পুলিশ বাহিনীকে দলীয় ক্যাডার হিসেবে ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দলীয় সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দখলে তুলে দিয়েছেন। যে ক'টি জেলায় যোগ্য গডফাদার যোগাড় করতে পেরেছেন সেখানে গোটা প্রশাসনকে ব্যবহার করে বিরোধী দলকে সমূলে উৎখাত করেছেন। হামলা, মামলা ও হত্যা চালিয়ে বিরোধীদলীয় সবাইকে ঘরছাড়া করে ছেড়েছেন।

পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ের নীলনকশা

ক্ষমতা ত্যাগের পূর্বের শেষ তিন মাসে তিনি তুফান বেগে বহু রকমের পদক্ষেপ নিয়েছেন, যাতে কেয়ার-টেকার সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও তিনি ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় নির্বাচন হলে যে ফল হওয়া স্বাভাবিক সে ফলই তিনি অর্জন করতে সক্ষম হন।

১. সকল সচিবের পদ, ডিসি ও এসপি এবং উপজেলা নির্বাহীর পদে তিনি এমন অফিসারদের বসানোর ব্যবস্থা করেছেন, যারা নির্বাচনে তার দলকে কমপক্ষে ২০০ আসন উপহার দেওয়ার দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারবে। তাই তিনি ও তার দলের নেতারা পূর্ণ আস্থার সাথে বারবার দাবি করে এসেছেন যে, আগামী নির্বাচনে অবশ্যই তারা বিরাট বিজয় লাভ করবেন। এর জন্য তিনি একটি থিওরিও আবিষ্কার করেছেন। তা হল এই যে, নির্বাচিত সরকার যা কিছু করেছে তার উপর হাত দেওয়ার কোন এখতিয়ার অনির্বাচিত কেয়ার-টেকার সরকারের নেই। তাই তিনি ধারণা করেছিলেন যে, তার সেট করা অফিসারদের বদলি করা যাবে না।

   তার এ হাস্যকর তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের এক ঘণ্টার মধ্যেই ১৩ জন সচিবকে বদলি করায় শেখ হাসিনা এর তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এ পদক্ষেপকে 'সিভিল ক্যু' বলতে লজ্জাবোধ করেননি।

   ক্ষমতার নেশায় মত্ত হাসিনা এটুকু উপলব্ধি করতেও ব্যর্থ হয়েছেন যে, নির্বাচিত সরকারের মতই তত্ত্বাবধায়ক সরকারও সাংবিধানিক মর্যাদায় সমান অধিকারী। অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে বিরাট দায়িত্ব সংবিধান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর অর্পণ করেছে, এর বৈধ প্রয়োজনে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আছে।

২. বাংলাদেশ টেলিভিশনকে কেয়ার-টেকার সরকারের আমলে একচেটিয়া বাপ-বেটির বাক্স হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না বলে বিটিভির প্রযুক্তি ও মেশিনারি ব্যবহার করেই ইটিভি নামে তার ব্যক্তিগত একটি চ্যানেল দু'বছর আগে থেকে চালু করেছেন, যাতে নির্বাচনে তার পক্ষে একতরফা প্রচারণা করা সম্ভব হয়। চক্রান্তকারীরা কৌশলে বড়ই দক্ষ। সরকারি টেলিভিশনকে সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

দলীয় যন্ত্রে পরিণত করা হয় এবং একুশে টেলিভিশনে বিরোধী দলের কিছু খবরও দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সরকারবিরোধী দর্শকদের কাছে একুশে টেলিভিশনকে গ্রহণযোগ্য করা।

কেয়ার-টেকার সরকার বিটিভিতে সব দলের খবর পরিবেশন করায় এখন একুশে টিভি শেখ হাসিনার খবর একচেটিয়া দিচ্ছে। বিটিভি এখনও আওয়ামীদের খবর বিএনপি থেকেও বেশি দিয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ এবং মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক গালি দিয়ে জনগণের মধ্যে চরম বিরোধ সৃষ্টি করে শেখ হাসিনা দেশের যে সর্বনাশ করেছেন তা থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্য আগামী নির্বাচনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা করতে হবে।

কেয়ার-টেকার সরকার এ উদ্দেশ্যে যে ক'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এতেই শেখ হাসিনা আতঙ্কিত হয়ে প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন এবং কেয়ার-টেকার সরকারের উপর সর্বতোভাবে চাপ প্রয়োগ করছেন।

জোট সরকারের পতনের আন্দোলন

২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনে শেখ হাসিনা অপ্রত্যাশিতভাবে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। '৯৬-এর নির্বাচনে অর্জিত আসনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি আসন লাভ করেন। এ পরাজয় তিনি কিছুতেই মেনে নিলেন না। এ নির্বাচনকে ব্যালট-ডাকাতির নির্বাচন ও চরম কারচুপির নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত শপথ নিলেও এক বছর পর্যন্ত তিনি তার দলীয় সদস্যদেরকে সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে দেননি।

বিবিসি খ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট জনাব সিরাজুর রহমান দৈনিক ইনকিলাবে ২০০৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি "শেখ হাসিনা ঠেকেও শিখতে পারলেন না" শিরোনামে লিখেন, "সাবেক প্রধানমন্ত্রী ২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকেই নতুন নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছেন। সমস্যা এই যে, শেখ হাসিনা জয়ী হতে না পারলে কোন নির্বাচনের ফলাফলই মেনে নিতে রাজি হন না। এ মুহূর্তে নির্বাচন হলে অবশ্যই ২০০১ সালের চেয়েও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে আওয়ামী লীগ। তখন আবার নতুন নির্বাচনের দাবি উঠতে বাধ্য। কেননা সেটাই হচ্ছে শেখ হাসিনার রাজনীতির চরিত্র। সেটা যারা ভোট দিয়ে সংসদ নির্বাচন করেছে তাদের প্রতি গুরুতর অপমান। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে যারা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন শেখ হাসিনা তাদেরও সংসদে যেতে দিচ্ছেন না। সেটা তাদের এবং ভোটারদের প্রতি অবিচার। যেসব গণতান্ত্রিক কর্তব্য পালনের জন্য জনসাধারণ ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচিত করেছে সে কর্তব্য পালন থেকে দলনেত্রী তাদের বঞ্চিত করছেন। রাজনৈতিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থেকে নেত্রী তাদের বঞ্চিত করছেন। একটি দরিদ্র দেশের বিপুল

www.pathagar.com

সম্পদ ব্যয় করে গণতন্ত্রের গরজে যে নির্বাচন করা হলো সে নির্বাচনকে অথর্ব করে দিয়ে হাসিনা জনসাধারণের সম্পদ অপহরণের কাছাকাছি অপরাধ করছেন। সারকথা, তার খেয়ালখুশি মতো যখন-তখন নির্বাচন করতে হলে বাংলাদেশ শীগ্‌গিরই ফতুর হয়ে যাবে।

শেখ হাসিনা নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেননি বলেই জোট সরকারের পতনের আন্দোলন তার জন্য অপরিহার্য। প্রশ্ন হলো, কেমন করে পতন হবে? তিনি চাইলেই পতন হয়ে যাবে? তিনি আন্দোলনের পথ বেছে নেন। তার দলের মহাসচিব জনাব আবদুল জলিল এ বছরের (২০০৪) ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা করেন যে, জোট সরকার ৩০ এপ্রিল পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। দেশবাসী স্তম্ভিত হয়। দু-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে যে সরকার কায়েম হয়েছে তা বিরোধী দলের নির্ধারিত তারিখে কেমন করে পদত্যাগে বাধ্য হতে পারে তা দেখার জন্য জনগণ কৌতুক ও ঔৎসুক্যের সাথে অপেক্ষা করতে থাকে।

জনাব আবদুল জলিল নির্দিষ্ট দিনের কয়েকদিন পূর্বে বিশেষ ট্রামকার্ড প্রয়োগ করার হুমকি দিলেন। পরে ট্রামকার্ডের রহস্য ফাঁস হয়ে যায়। প্রশিকা নামে পরিচিত একটি বড় এনজিও সারাদেশ থেকে তাদের সাথে জড়িত কয়েক লক্ষ্য মানুষকে রাজধানীতে জড়ো করে সরকারকে অচল করে দিলে নাকি জোট সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এ ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার ফলে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

জোট সরকারের পদত্যাগ দাবি

জোট সরকারের পতনের আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর আওয়ামী লীগের কর্মসূচি সরকারের নিকট পদত্যাগ দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ৩০ এপ্রিলের টার্গেট মার খেয়ে গেলে আওয়ামী লীগ সংসদে যোগদান করে সংসদ ও রাজপথে উভয় ময়দানেই আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সংসদে তাদের আসন শূন্য হবার শঙ্কা দূর করার জন্যই হোক, অথবা আর কোন বিকল্প না থাকার দরুনই হোক, শেষ পর্যন্ত লজ্জা-শরম ত্যাগ করে সংসদে যোগদান করলে জোটের সকল সংসদ সদস্য তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। কেউ কেউ আশা করেছিলেন যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য অনুযায়ী আওয়ামী লীগ এমপিগণ শালীনভাবেই বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করা শুরু করবেন। ৩০ এপ্রিলের ব্যর্থতার গ্লানি দূর করার জন্য হয়তো সুমতির পরিচয় দেবেন।

বাজেট অধিবেশনে কথায় কথায় পয়েন্ট অব অর্ডারের দাবি তুলে বাজেট পাস করার পথে বারবার বাধা সৃষ্টি করা থেকে তাদেরকে বিরত করতে স্পীকারকে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। সংসদ পরিচালনার নিয়ম বহির্ভূত উপায়ে বক্তব্য রাখার অপচেষ্টা করে তারা সংসদের বহু মূল্যবান সময়ের অপচয় করেন। বিগত বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে শেখ হাসিনা এক ঘণ্টারও বেশি সময় সংসদে

www.pathagar.com

বক্তৃতায় জোট সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তার স্বভাবসুলভ অশালীন কথা বলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা শুরু করার আগেই তিনি সংসদ থেকে বের হয়ে যান। তিনি যা বলেছেন এর কোন জওয়াব শুনবার মতো সাহস তিনি দেখাতে ব্যর্থ হন। প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত ধৈর্য ও শালীনভাবে শেখ হাসিনার জওয়াব দিলেন। এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, প্রধানমন্ত্রীর পদ মর্যাদা নিয়ে তাঁর সামনে কেউ কথা বলুক তা সহ্য করার মতো শক্তি তার নেই। তিনি হিংসার আগুনে কতদিন জ্বলবেন আল্লাহই জানেন।

পদত্যাগ দাবির যুক্তি

শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে জোট সরকারের পদত্যাগ দাবির যুক্তি হলো ঃ

১. সন্ত্রাস দমনে সরকারের ব্যর্থতা।
২. প্রধানমন্ত্রী ও মাওলানা নিযামী সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে বিরোধী দলকে নির্মূল করতে চাচ্ছে।
৩. সরকার দেশকে একটা অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করছে।
৪. এ সরকার তালেবান, ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে।

দেশবাসী জানে যে, শেখ হাসিনার শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে সন্ত্রাস চলতো। ফেনীর কুখ্যাত সন্ত্রাসী হাজারী সম্পর্কে তিনি জনসভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, "হাজারী ছিলো, হাজারী আছে ও হাজারী থাকবে।" লক্ষ্মীপুরে তাহের, গফরগাঁয়ে আলতাফ গোলন্দাজ, নারায়ণগঞ্জে শামীম ওসমান, ঢাকায় হাজী সেলিম, ডাঃ ইকবাল, কামাল মজুমদার ও মকবুল হোসেন এবং বরিশালে হাসানাত আবদুল্লাহ প্রমুখ। শেখ হাসিনা কি প্রমাণ করতে পারবেন যে, দেশে কোথাও খালেদা জিয়া কোন ব্যক্তিকে সন্ত্রাসের গড ফাদার বানিয়ে রেখেছেন?

সন্ত্রাস দমনে সরকারের ব্যর্থতার জন্য কি শেখ হাসিনা অনেকখানি দায়ী নন? তার আমলে যে ব্যাপক সন্ত্রাস চালু করা হয়েছে তা কি দমন করা সহজ? তিনি যে ক্ষমতা ত্যাগের কাছাকাছি সময়ে তার সোনার ছেলেদেরকে ব্যাপকভাবে অস্ত্রের লাইসেন্স দিয়েছেন সেসব অস্ত্র কি এখন সক্রিয় নয়?

তার আমলে যে বড় বড় কয়টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে সেসবের কোন তদন্ত করার ব্যবস্থাও করেননি। জোট সরকার তার জনসভায় ২১ আগস্ট (২০০৪) নৃশংস গ্রেনেড হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এ তদন্তে সামান্য সহযোগিতা করতেও তিনি সম্মত নন। তদন্ত কমিশনের চিঠিও তিনি গ্রহণ করতে বারবার অস্বীকার করেছেন। আসলে তিনি তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষী চিহ্নিত করতে চান না। কেননা তিনি তো গায়েবী ইলমের মাধ্যমে জানেন যে, খালেদা জিয়া স্বয়ং এর জন্য দোষী। বিস্ময়ের বিষয় যে, তিনি বেগম জিয়াকে এমন নির্বোধ কেমন করে মনে করেন যে, তিনি এমন একটা ঘটনা ঘটিয়ে তার সরকারকে

www.pathagar.com

এমন বে-কায়দায় ফেলবেন? শেখ হাসিনা যুক্তির ধার ধারেন না। তার আমলের সকল বোমাবাজির জন্য তিনি তথাকথিত মৌলবাদীদেরকে দোষী বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু একটি ঘটনার সাথেও কোন ইসলামী দল বা ব্যক্তিকে অপরাধী বলে প্রমাণ করার প্রয়োজন মনে করেননি।

আজব দেশপ্রেম

কারো দেশপ্রেমে আমি সন্দেহ করা সঠিক মনে করি না। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থে কেউ এমন কিছু করতে পারে যার পরিণামে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে যায়। নবাব সিরাজুদ্দৌলার সেনাপতি মীর জাফর আলী খান নবাব হবার উৎকট লোভে অন্ধ হয়ে ইংরেজ নেতা ক্লাইভের ফাঁদে পা দিলেন। দেশ ইংরেজদের দখলে চলে যাক এমন মারাত্মক উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এ কাজ হয়তো করেননি। লোভে অন্ধ হয়ে গেলে পরিণাম দেখার ক্ষমতা আর থাকে না।

আমি একথা বিশ্বাস করি না যে, শেখ মুজিব এদেশে ভারতের আধিপত্য কায়েমের নিয়তে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দলীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হলো এবং পরবর্তীতে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো। ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার ঐ আন্দোলনে শেখ মুজিব ছাত্র-নেতা হিসেবে বিরাট অবদান রাখেন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। ঐ নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগ বিরাট বিজয় লাভ করে। কিন্তু ১৯৫৫ সালে যুক্তফন্ট যখন বিভক্ত হয়ে গেলো তখন ৩০০ আসনের সংসদে ৭২ জন হিন্দু সদস্যের হাতে ক্ষমতার ভারসাম্য এসে যায়। তারা আওয়ামী মুসলিম লীগকে সাম্প্রদায়িক দল হওয়ায় শেরে বাংলার কৃষক শ্রমিক পার্টিকে সমর্থন দিয়ে ক্ষমতায় বসালো। নিছক ক্ষমতার লোভে আওয়ামী লীগ হিন্দু সদস্যদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে দলের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে 'মুসলিম' শব্দ ত্যাগ করলো এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। এ সবের বিস্তারিত আলোচনা ৭১ ও ৭২ কিস্তিতে রয়েছে (যা 'জীবনে দেখলাম' ২য় খণ্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠা থেকে ১৬৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে)। আওয়ামী মুসলিম লীগের ঐ আদর্শিক পরিবর্তনের ফলেই আজ এ দেশ ভারতের আধিপত্যের শিকারে পরিণত হয়েছে।

২০০১ সালের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পরাজয়ের পর শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ ও ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদী সকল দল, বুদ্ধিজীবী মহল এবং বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা এমন রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, যা এ দেশে ভারতীয় আধিপত্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করছে। এসব মহলে এমন কতক নেতাও আছেন, যারা ইসলামের 'মুসীবত' থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সাথে মিলিত হতেও আগ্রহী। এর মানে যে, ভারতের গোলামি তা কি তারা বুঝেন না।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার ভূমিকা

শেখ হাসিনা গণতান্ত্রিক রীতি ও পদ্ধতির কোন ধার ধারেন না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল সরকারি দলের বিরুদ্ধে সংসদে গঠনমূলক নীতি অনুযায়ী শালীন ভাষায় কঠোর সমালোচনাও করে। তাদের পলিসির পক্ষে জনমত গড়ার উদ্দেশ্যে সরকারি নীতি ও পলিসির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা ও তীব্র সমালোচনা করাও অগণতান্ত্রিক নয়। কিন্তু কোন গণতান্ত্রিক দেশের বিরোধী দল বিদেশে গিয়ে প্রকাশ্যে জনগণের মধ্যে বা গোপনে বিদেশী সরকারের নিকট নিজের দেশের সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার চালায় না। প্রতিবেশী ভারতে গুজরাট প্রদেশের আহমদাবাদে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমর্থনে পুলিশ ও উগ্র হিন্দুরা মুসলমানদের উপর গণহত্যা, এমনকি পুড়িয়ে মারা, নারী ধর্ষণ ও শিশু হত্যার মতো চরম পশুত্ব প্রদর্শন করা সত্ত্বেও বিরোধী দল কংগ্রেসের কোন নেতা বা নেত্রী বিদেশে গিয়ে বি.জে.পি সরকারের বিরুদ্ধে সামান্য অভিযোগও করেনি।

শেখ হাসিনা আমেরিকা ও ইউরোপ সফর করে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদেরকে চরম ও ব্যাপক নির্যাতন করা হচ্ছে বলে ঘৃণ্য মিথ্যা অপপ্রচারণা চালিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিশ্ব-নেতৃবৃন্দকে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। অথচ আহমদাবাদে মুসলিম গণহত্যার বিরুদ্ধে দেশে সামান্য নিন্দাও জানাননি। ভারতে বারবার মুসলিম হত্যার ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও বাংলাদেশে একজন হিন্দুর উপরও সামান্য হামলা করা হয়নি।

যদি দেশে সত্যিই সংখ্যালঘুদের উপর কোন নির্যাতন হয়ে থাকে তাহলে জননেত্রী হিসেবে দেশে জনসভায় জনগণকে এ ধরনের অন্যায় করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতেন। যদি কোথাও তিনি এমন কোন উপদেশ দিতেন তাহলে জনগণ তার মুখের উপর তীব্র প্রতিবাদ জানাতো।

তার এ অপপ্রচারে প্রশ্রয় পেয়ে তথাকথিত হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ নামের এক উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন বিদেশে, এমনকি নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘ সদর দপ্তরে পর্যন্ত এ জঘন্য মিথ্যা অভিযোগের প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন। শেখ হাসিনা এ অপপ্রচারের সূচনা না করলে কেউ তাদের প্রচারকে সামান্য গুরুত্বও দিতো না। বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ এ জাতীয় অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে বারবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও অপপ্রচার গোয়েবলসীয় কায়দায় চালু রয়েছে।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও জিমি কার্টার এদেশ সফর করে দেশটিতে চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন। আমেরিকার বেশ কয়েকজন সিনেটর, কংগ্রেসম্যান ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ সফরে এসে অনুরূপ স্পষ্ট সার্টিফিকেট দিয়েছেন। কেউ সংখ্যালঘুদের সামান্য নির্যাতনের কোন প্রমাণও পাননি। তবু এ অপবাদ বর্ষণ অবিরাম চলছে। শেখ

www.pathagar.com

হাসিনার নিকট সবচেয়ে জঘন্য মোক্ষম ও কার্যকর অপবাদ হলো ৪ দলীয় জোট সরকারকে 'তালেবান সরকার' ও 'মৌলবাদীদের' সরকার বলা। তিনি মনে করেন যে, সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের প্রচারে কেউ বিশ্বাস না করলেও 'তালেবান সরকার' অপবাদটি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। জামায়াতে ইসলামী জোট সরকারে শরীক আছে, তার ধারণা যে, এ অপবাদটিকে হয়তো সহজে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী এদেশে ভুঁইফোড় কোন সংগঠন নয়। গত পঞ্চাশ বছরে জনগণের মধ্যেই এ দলটি গড়ে উঠেছে। তবু অব্যাহতভাবে এ অপপ্রচার তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ অপপ্রচারের হীন উদ্দেশ্য

বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকায় এসব অপপ্রচার চালাবার হীন উদ্দেশ্য হচ্ছে, জর্জ বুশের মতো হিটলার স্বভাবের নেতাদেরকে বাংলাদেশের উপর আফগানিস্তানের মতো চড়াও হবার উসকানি দেওয়া। হয়তো তিনি এ দুরাশার শিকার হয়েছেন যে, বুশ-ব্লেয়াররা আফগানিস্তানের মতো বাংলাদেশেও তাদের সেনাবাহিনী পাঠিয়ে জোট সরকারকেও উৎখাত করে শেখ হাসিনাকে হামিদ কারজাইর মতো ক্ষমতায় বসিয়ে দেবেন। বুশ-ব্লেয়াররা যেসব স্বার্থ হাসিলের জন্য আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করেছেন, বাংলাদেশে ঐ জাতীয় কোন স্বার্থের সুযোগ নেই।

শেখ হাসিনার এটুকু 'আকল' থাকা উচিত ছিলো যে, শুধু তার অপপ্রচারে বুশ-ব্লেয়াররা তার কুআশা পূরণ করতে এগিয়ে আসবেন না। এসব অপপ্রচার দ্বারা তিনি জনগণের নিকট যে ধিক্কৃত হচ্ছেন তা উপলব্ধি করার সাধ্যও তিনি হারিয়ে ফেলছেন। ক্ষমতার জন্য তিনি যতই পাগল হন না কেন, ২০০৬ সালের শেষ দিকে কেয়ার-টেকার সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে। ঐ নির্বাচনে জনসমর্থন লাভ করার জন্য তার বর্তমান রাজনৈতিক ভূমিকা সহায়ক হবে কিনা তা বিচার করে দেখতে পারেন।

শেখ হাসিনার রাজনীতি কার স্বার্থে?

এ বছর (২০০৪ সাল) শেখ হাসিনা ভারত সফরে যান। এটা তার ব্যক্তিগত সফর বলে দাবি করলেও তিনি ভারতের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস দলীয় নেত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা ইত্যাদি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রচার করা হয় যে, দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি তাদের সাথে আলোচনা করেন। বাংলাদেশের স্বার্থের পক্ষে কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা জানা গেলো না। একটি বিষয়ের কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন, যা ভারতের স্বার্থের সম্পূর্ণ পক্ষে এবং বাংলাদেশের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

তিনি বলেন, বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত ভারতীয় অঙ্গরাজ্যসমূহে যারা দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলন করছে তাদেরকে বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়া হয় এবং সেখানে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বলে তারা অভিযোগ করলে তিনি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেন ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন। তিনি নাকি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে এর প্রতিবাদ করতে পারেননি। তাই এ বিষয়ে সঠিক খবর দেবার দায়িত্ব বেগম জিয়ার সরকারের বলে তিনি ঘোষণা করেন।

এ মিথ্যা অভিযোগ শেখ হাসিনার শাসনামলেও করা হয়। তখন তার সরকার এ অভিযোগ অস্বীকার করে। তারা আবার এ অভিযোগ তুললে বিব্রত ও লজ্জিত না হয়ে তার পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা কর্তব্য ছিলো। জোট সরকারের বিরুদ্ধে হিংসার কারণে তিনি এ অভিযোগ অস্বীকার না করে ভারতের স্বার্থেই নিশ্চুপ থেকে বাংলাদেশকে অপরাধী বলে স্বীকৃতি দিলেন। এতে কি দেশপ্রেমের সামান্য কোন পরিচয়ও পাওয়া যায়?

মনোমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তার প্রথম বক্তৃতায়ই বাংলাদেশের সাথে সব বিষয়ে সমঝোতা ও আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করার কথা খোলা মনে প্রকাশ করেন; কিন্তু শেখ হাসিনার ঐ সফরের পর থেকেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বাজপেয়ী সরকারের সময়কার সকল অভিযোগ নতুন করে উত্থাপন করা হয়।

হয়তো সংখ্যালঘুদের উপর বাংলাদেশ সরকারের নির্যাতনের কথাও ভারতের নেতাদেরকে জানাতে ভুলেননি। জোট সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ বিদেশে প্রচার করার পরিণামে যে দেশের ভাব-মর্যাদা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয় সে কথা বুঝার মতো যোগ্যতাও তিনি হারিয়েছেন। দেশের জনগণকে তিনি এতোটা বোকা মনে করে থাকলে আগামী নির্বাচনে টের পাবেন। তিনি যে বাংলাদেশের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে রাজনীতি করছেন সে কথা জনগণের বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। তিনি ভারত সরকারকে যত ঘনিষ্ঠ বন্ধুই মনে করেন, বাংলাদেশের জনগণ ভারতকে যে মোটেই বন্ধু মনে করে না তা তিনি এখনও টের না পেয়ে থাকলে যথাসময়ে টের পাবেন।

সমাপ্ত